রহস্যের গোলকধাঁধাঁ

ঘনশ্যাম চৌধুরী

রহস্যের গোলকধাঁধা

ঘনশ্যাম চৌধুরী

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় ।
৬/১ এ. ধীরেন ধর সরণী । কলিকাতা

প্রকাশক
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২

প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৫

মুদ্রক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রয়াত পিতৃদেব

৺অহীন্দ্রকুমার চৌধুরীকে

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.bengaliboi.com
Click here

সূচি

গঙ্গারিডির বিষ	৯
ছোবল	৫৮
মধ্যরাতের ছায়া	১১৫

গঙ্গারিডির বিষ

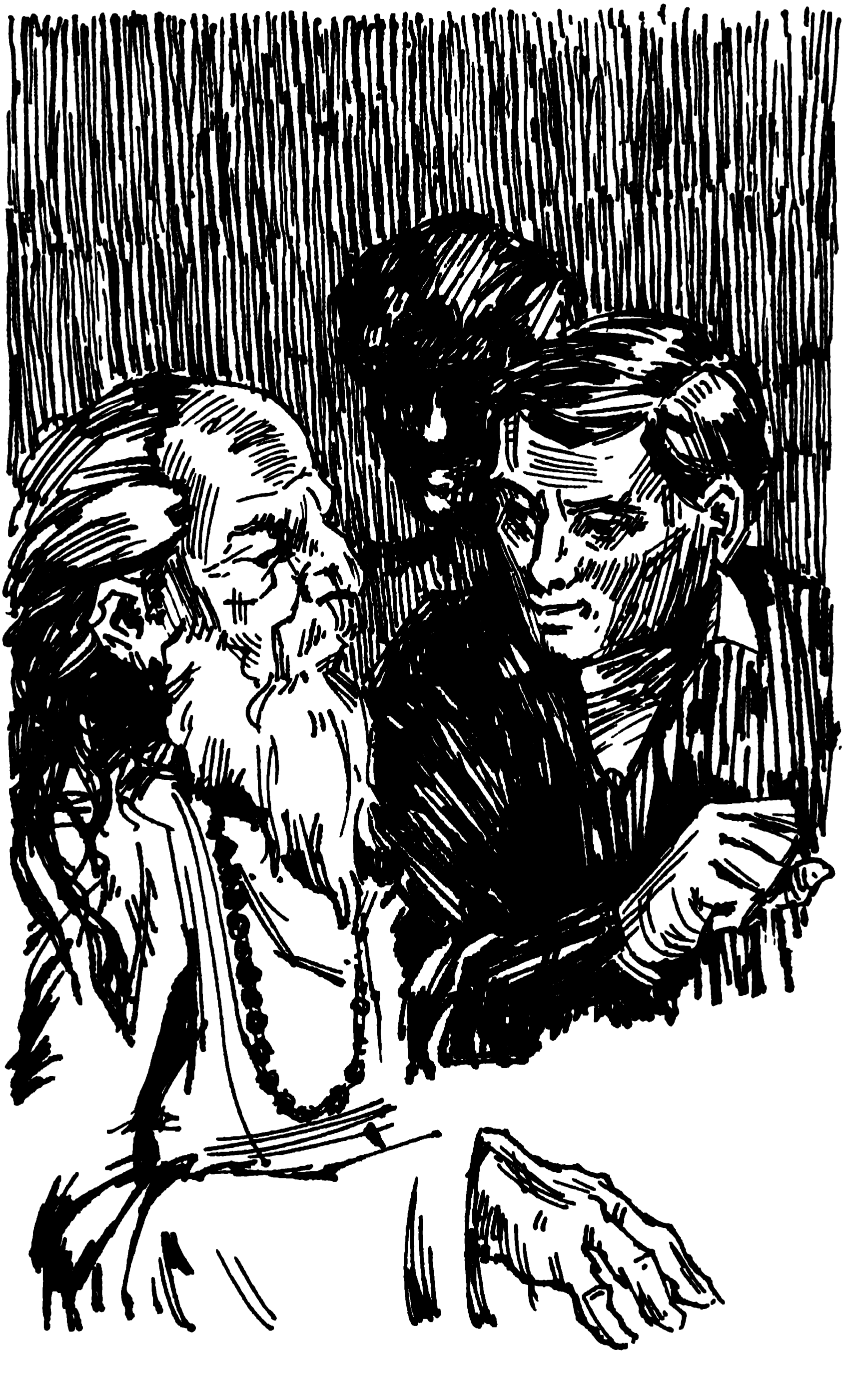

বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি সেদিন সকালে ঘুম থেকে একটু দেরিতেই উঠেছিল। ও থাকে শিয়ালদার ডিক্সন লেনের একটা মেসে। ঘুম থেকে উঠে ও খবরের কাগজগুলো ওল্টাচ্ছিল। তখনই নিচে থেকে রান্নার ঠাকুরের ডাক শোনা গেল। বদ্রীবাবু, বদ্রীবাবু। আপনার টেলিফোন।

বদ্রীনারায়ণ দুদ্দাড় করে নিচে নেমে টেলিফোন তুলল, হ্যালো!

হ্যালো, কে? বদ্রী বলছিস? আমি কেদারদা বলছি রে!

বলুন কেদারদা।

শোন। কালকে ইদুজ্জোহা, সব ছুটি। সকালেই আমার এখানে চলে আয়। এখান থেকে একটু বেলগাছিয়া ভিলায় যাব। লাঞ্চ এখানে এসে খাবি।

আচ্ছা। ঠিক আছে। কিন্তু কী আছে ওখানে?

আছে আছে। রহস্য রোমাঞ্চ কত কী আছে। চলে তো আয়! তারপর শুনবিখন সব কথা।

পরদিন বদ্রীনারায়ণ সকাল ন'টা বাজবার পাঁচ-সাত মিনিট আগেই কেদার মজুমদারের ক্যারাটে ক্লাব 'উদিতভানু'-তে পৌঁছে গেল। কেদার মজুমদার তখন সবেমাত্র এক্সারসাইজ করে উঠেছেন। সারা শরীরে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। কস্টিউম-পরা কেদারদার চেহারা বদ্রী আজই প্রথম দেখল। বদ্রী চোখ গোল গোল করে দেখছিল কেদার মজুমদারকে। হাত-পা-বুকের মাস্‌লগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আলাদাভাবে। কেদার মজুমদার তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে বললেন, কী রে, এসে গেছিস!

হ্যাঁ, আপনি তো এখনও রেডি হননি!

আরে এক্ষুণি রেডি হয়ে যাচ্ছি। তুই ঘরে গিয়ে বোস না।

সত্যিই খুব দ্রুত রেডি হয়ে গেলেন কেদার মজুমদার। বদ্রীনারায়ণ লক্ষ্য করছিল। ছকবাঁধা কাজ কেদারদার। দশ মিনিটের মধ্যেই একেবারে ফিট কেদারদা। একটা পায়জামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছেন। দারুণ লাগছিল।

বদ্রীনারায়ণের মুখটা খুবই সফ্‌ট। তার ওপর ওর নীল চোখ। চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বদ্রীনারায়ণ যখন একান্তভাবে কোনও কিছু পর্যবেক্ষণ করে,

চোখদুটো আরও মায়াবী হয়ে যায়। কেমন একটা নারীসুলভ কান্তি এসে পড়ে চোখেমুখে। কেদার মজুমদার ব্যাপারটা অনেকদিন আগে থেকেই ধরেছেন। ক্রমশ ভাবনার স্তরে ডুবে যেতে যেতে বদ্রীনারায়ণ যেন অন্য কোনও গ্রহের মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেদার বদ্রীর চিন্তাশক্তির পরিচয় পেয়েছেন প্রথম দফায় সুন্দরবনে অভিযান চালাতে গিয়ে। বদ্রীর চিন্তার তরঙ্গে ধরা পড়ে গভীর বিশ্লেষণ। আগাম ঘটনার সঙ্কেত। ওর মধ্যে ম্যাচিওরিটির যেটুকু অভাব আছে, তা ওর অল্প বয়স আর অল্প অভিজ্ঞতার জন্য। না হলে বদ্রীনারায়ণ একটা জিনিয়াস। ওকে প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আনতে হবে। ছক কষে অঙ্কের মত হিসেবে ফেলে ওকে তৈরি করা দরকার।

আপনার কাজকর্ম খুব নিখুঁত কেদারদা। কোনও মিস্টেক নেই। কেদার মজুমদার বদ্রীর কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, বদ্রীর কথাটা শুনে হাসলেন। মনে মনে বললেন, আমি ঠিকই ধরেছি। বদ্রী এখন আমাকে নিয়ে ভাবছে। মুখে বললেন, ছক কষে চলা আর মিস্টেক না হওয়া সফল গোয়েন্দাদের সাফল্যের আসল চাবিকাঠি।

ওরা দুজন রাস্তায় বেরলো। কেদার গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে একটু বেশি লম্বা। একটা অর্ডিনারি পায়জামা-পাঞ্জাবিতে বেশ ঝকঝকে আর স্মার্ট লাগছিল। ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে প্রখর ব্যক্তিত্ব—এই দুটোই ছিল কেদার মজুমদারের মধ্যে। বদ্রী এটা খেয়াল করেছিল। ও ভাবছিল, শিয়ালদার মেসে আমি যাদের সঙ্গে থাকি, তাদের থেকে কেদার মজুমদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই আলাদা। ওদের মধ্যে কতগুলো কমন বিষয়ে মিল আছে। কেদারদা যেখানে আনপ্যারালাল। কেদার মজুমদার বদ্রীকে নিয়ে চুপচাপই হাঁটছিলেন বাগবাজার স্ট্রিট ধরে। ওরা শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে বেলগাছিয়া ভিলায় যাবার জন্য বাস ধরবে। কেদার এতক্ষণে কথা বললেন, লক্ষ্যপথে এগোতে গেলে হ্যাফাজার্টলি চললে চলবে না। ছক কষেই চলতে হবে। তোমার আশেপাশে যা আছে, মনে রাখবে, সব দিক থেকেই নানা বাধা আসবে। পরিকল্পিত কাজ করে বাধাগুলো পেরোতে হয়। তবে কনফিডেন্স আসে। যত কঠিন কাজই হোক তাতে সাফল্যও আসে।

বদ্রী কথাটা শুনে সোজাসুজি তাকাল কেদারের দিকে। কেদার মজুমদারের চোখে অদ্ভুত এক ধরনের দীপ্তি। দেখে বদ্রীর শরীরটা শিরশির করে উঠল। বদ্রীর মন বলল, এইরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর ব্যক্তিত্ব যার আছে, সফলতা তার অবশ্যম্ভাবী।

বেলগাছিয়া ভিলায় একেবারে পূর্বপ্রান্তের শেষে পুরনো বাড়িটার তিনতলায়

উঠে কেদার কলিং বেল বাজালেন। বদ্রীকে বললেন, এই ভদ্রলোক বেশ রহস্যময় মানুষ। মনে হয় সামান্য ছিটগ্রস্ত। আর যদি উনি ছিটগ্রস্ত না হন, তবে উনি অসাধারণ মানুষ। ভয়ঙ্কর মানুষও বলা যেতে পারে। আমি যখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলব, তখন তোর কাজ হবে সবকিছু অবজারভেশন করা। লোকটার কথার মধ্যে মারপ্যাঁচ থাকলে বোঝার চেষ্টা করবি।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

এর বাড়িতে আমি আর একদিন এসেছিলাম।

কী করেন উনি?

অত কথা হয়নি। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলেছিলেন—

ঘ্যাঁচ-ক্যাঁওচ-ক্কট-ক্কটাৎ—চিঁইউঁই শব্দ করে হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। আওয়াজ শুনে বদ্রীনারায়ণ লাফিয়ে ওঠে আর কী! যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে দেখে বদ্রীনারায়ণ চমকে উঠল। আরে সর্বনাশ! অদ্ভুতদর্শন ভদ্রলোক। বৃদ্ধই বলা যায়। প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়েছেন। কিন্তু তবুও ঠিক বৃদ্ধ বলা যাবে না। মাথাভর্তি জটা। লম্বা লাল রঙের দাড়ি ঝুলে পড়েছে বুক পর্যন্ত। কোটরাগত লাল আর নীলের অদ্ভুত সংমিশ্রণে চোখের মণিদুটো তৈরি। বদ্রী ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালো। অসহ্য! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ভদ্রলোক হাসলেন। হাসলে ওর মুখটা ভয়াবহ হয়ে যায়। বললেন, আ রে কেদারবাবু যে! এসেছেন! হ্যাঁ, এখন দশটা বাজে। আপনি দেখছি বেশ পাংচুয়াল! অবাক কাণ্ড! বাঙালি জাতির তো এটা হবার কথা নয়। দশটায় বলে ঠিক দশটায় আসা। হেঁ-হেঁ! আপনি তো বেশিদিন বাঁচবেন না। অথবা অনেকদিন বাঁচবেন। আসুন! ঘরে আসুন!

ওরা দু'জন ঘরের ভেতর ঢুকল। সামনেটায় ড্রইংরুম। কোনও সোফাজাতীয় কিছু নেই। একটা সতরঞ্চি পাতা রয়েছে। আর দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা মোড়া রাখা আছে। জানালার ধার ঘেঁষে একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। টেবিল ক্লথটা বাঘের চামড়ার মতো ছাপা কাপড়ের। একটু দূর থেকে বাঘের চামড়া বলে ভুল হয়। টেবিলের ওপর একটা টেলিফোন। বদ্রী ভাল করে দেখল। হ্যাঁ। এটা মূল টেলিফোন নয়। মূল টেলিফোনটা আছে ঘরের ভেতরে। এটা এক্সটেনশন লাইন।

বসুন, বসুন। বলে মোড়া এগিয়ে দিল লোকটা।

আপনার সময়জ্ঞানের তো তারিফ করতেই হয় মশাই। আগের দিন পাংচুয়াল টাইমে এলেন, আজকেও তাই। বাঙালি তো এ রকম নয়! আমাকে তাহলে

বলতে গেলে একজন সাহেবের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, কী বলেন? মানে সাহেবী টাইম আর কী!

সাহেব-সুবোদের সঙ্গে তাহলে আপনার দহরম-মহরম আছে। তাই তো?

তা একটু আছে। ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি প্রখর। মিশলে জ্ঞান বাড়ে। আপনারও বোধহয় সাহেব-বন্ধু দু-চারটে আছে?

পরিচয় হয়েছিল। নবদ্বীপের মায়াপুরে সাহেবদের মন্দিরের সামনে। মেমসাহেব হেঁটে যাচ্ছিলেন। ভিড় ছিল। ভিড়কে তোয়াক্কা না করতে গিয়ে উনি আমার চটিব ওপর ওনার অতি উচ্চতাবিশিষ্ট হাইহিল জুতোটি তুলে দেন। আমার জুতোর ফিতে ছিঁড়ে যায়। সাহেব পেছন থেকে এসে আমাকে খুব 'এক্সকিউজ মি', 'এক্সকিউজ মি' করেছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে এই-ই আমার আলাপ-সালাপ।

বাঃ! ভদ্রতা দেখেছেন?

সে আর বলতে! অহঙ্কারি গিন্নীর মাটিতে পা পড়ে না। উনি আমার জুতোর ফিতে ছিঁড়ে দিলেন। স্বামীসাহেব গুনে গুনে দুবার দুঃখপ্রকাশ করে ঘাড় তুলে চলে গেলেন। আমি ফিতেছেঁড়া জুতো হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। বেশ ভাল বিষয়, না! যাই হোক, এবার আপনার কথাটা শুরু হোক।

সাহেব সর্ম্পকে খোঁচা খেয়ে লোকটা কুতকুত করে তাকিয়ে রইল কেদারের দিকে। দশ সেকেণ্ড চুপচাপ। বদ্রী হিসাব রাখছিল। ঘরটা কেমন থমথমে হয়ে গেল। ভদ্রলোকের চোখদুটো ভাঁটার মতো জ্বলছিল। তবে সেকেণ্ড দশেক মাত্র। তারপর ঝটিতি স্বাভাবিক হয়ে লোকটা কথা শুরু করে দিল। বসুন, বসুন। এই ছেলেটি কে? পরিচয়—

কেদার মজুমদার তাড়াতাড়ি কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, সরি, সরি! আমার আগেই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ও হল বদ্রী। বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি। সুন্দরবন অভিযানে ও আমার দক্ষিণহস্ত ছিল বলতে পারেন। ভারী ভাল ছেলে। বুদ্ধিমান ছেলে।

বাঃ। পরিচয় পেয়ে ভাল লাগল খোকা। তবে খুব ছেলেমানুষ। গোয়েন্দার সহকারি হিসাবে বাস্তবে মানায় না। সে যাই হোক। ফলেন পরিচীয়তেঃ!

হ্যাঁ। ফলেন পরিচীয়তেঃ। আপনার কথা শুরু করুন।

কথা শুরুর আগে ভদ্রলোক বদ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তো আমার নাম জান না। কেদারবাবু আমাকে ঠিক বিশ্বাসও করছেন না, অবিশ্বাসও করছেন না। কৌতূহল আছে বলে ছুটেও এসেছেন। আবার খানিকটা অবজ্ঞাও করছেন।

কথাটা শুনে কেদার মজুমদার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনার বোধহয় দ্রুত সিদ্ধান্ত করার একটা প্রবণতা আছে। দ্রুত সিদ্ধান্ত যাঁরা নিতে পারেন তাঁরা অবশ্যই শক্তিমান এবং পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু সবার পক্ষে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া সঠিক নাও হতে পারে। কথাটা বলে কেদার মজুমদার হাসলেন। হেসে বদ্রীকে বললেন, বদ্রী, ইনি হচ্ছেন শ্রী চন্দ্রনাথ বর্ধন। এর বেশি পরিচয় আমি এখনও এনার কাছ থেকে পাইনি। সুন্দরবন এবং আশপাশের অঞ্চল, মানুষজন, অতীত, বর্তমান এবং নিম্ন গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইনি দীর্ঘ এবং পরিশ্রম-সাপেক্ষ গবেষণা করেছেন। এ ব্যাপারে ওনার কাছে ডিটেলসে শুনব বলেই আজকে এখানে এসেছি।

আপনারা চা খাবেন ?

তা একটু হলে মন্দ হয় না।

চন্দ্রনাথবাবু হাঁক দিলেন, জগন ! দু' কাপ চা বানাও !

ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর এল, দুধ দিয়ে ? না দুধ ছাড়া ?

কেদার মজুমদার বলে দিলেন, দুধ ছাড়াই খাই।

কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে জগনের গলার আওয়াজ পেয়েই বদ্রীনারায়ণের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সজীব হয়ে উঠল। শিরশির করে উঠল শরীরটা। কোথায় সে এই গলার আওয়াজ শুনেছে ! কোথায় ? আশ্চর্য ! বদ্রী কিছুতেই মনে করতে পারছে না। বদ্রী চোখ দু'টো বুজে দু'হাতের আঙুল দিয়ে কপালের রগ দু'টো চেপে ধরল। জগনের গলার আওয়াজটা যেন ইথার তরঙ্গে বাহিত হয়ে বারেবারে বদ্রীর মস্তিষ্কে আঘাত করছিল। কিন্তু বদ্রী মেলাতে পারছিল না কোনও ঘটনার সঙ্গে এই কণ্ঠস্বরকে। তবুও একটা বিপদের আশঙ্কা ঘূর্ণির মত পাক দিতে দিতে বদ্রীনারায়ণকে গ্রাস করে ফেলল। ঘরের ভেতর থেকে চায়ের কেটলি, কাপডিসের আওয়াজ আসছিল। এই ফ্ল্যাটেরই পাশের গেটটা খোলার শব্দ হল। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। বদ্রী এবার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছিল। তবুও কাঁটার মত একটা কিছু খচখচ করছিল ওর মনে। কেদার মজুমদার বললেন, কী ! শরীর ভাল লাগছে না ?

না, না। ঠিক আছি।

ভেতরের দরজা খুলে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ে একটা ট্রে-তে করে দু কাপ ধুমায়িত লিকার চা রেখে গেল। পাশে একটি প্লেটে কিছু নোনতা বিস্কুট। খোলা দরজা দিয়ে বদ্রী আড়চোখে ভেতরটা দেখল। কাউকে দেখা গেল না। চন্দ্রনাথবাবু বদ্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। মুখে কিছু বলেননি। এবার বললেন, নিন। চা খান !

চায়ে চুমুক দিয়ে কেদার মজুমদার চন্দ্রনাথ বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। এবার আপনার কথা শুরু করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, কলকাতায় অনেক বিখ্যাত গোয়েন্দাই রয়েছেন। কিরীটি রায়, পরাশর বর্মা, ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা ফেলু-তোপসে জুটি—এদের কাউকে চয়েস না করে আপনাকে করার বিশেষ কারণ আছে। আমি জেনেছি, সুন্দরবন সম্পর্কে আপনার পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সদ্য সদ্য এক সফল অভিযানও করেছেন। আমার বিষয়টাও সুন্দরবন। তাই আপনাকে ডাকা।

থ্যাঙ্ক ইউ।

আমার যেটা বলবার, তা হল, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সুন্দরবন এমন গভীর বনাঞ্চল ছিল না। এই নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার কোন কোন জায়গায় জঙ্গল ছিল ঠিকই, তবে কোথাও কোথাও উন্নত জনবসতিও ছিল। রামায়ণের যুগের পর থেকে এখানকার মানুষ উন্নত নগরসভ্যতা তৈরি করে।

আপনি কী করে জানলেন ?

আমি গল্প শোনাব বলে আপনাকে ডাকিনি। চল্লিশটি বছর আমি এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি। কোন ইউনিভার্সিটির আণ্ডারে কাজ করলে চারটে বিষয়ের ওপর ডক্টরেট পেয়ে যেতাম। সুন্দরবনের অণু-পরমাণু পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে আমি তার উৎস খুঁজে দিতে পারি।

আচ্ছা বলুন।

প্রথমে ওই অঞ্চলে যারা বাস করত তারা হল প্রাচীন গাঙ্গেয় জাতি। বিদেশিরা এদের গঙ্গারিডি বলত। গঙ্গারিডিরা ছিল শৌর্য-বীর্য-স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ এক শক্তিশালী সুসভ্য জাতি।

এরা এখন কোথায় গেল ? এদের উত্তরপুরুষই বা কারা ?

বিদেশিরা যাদের ট্রাইব অব গঙ্গারিডি বলত, তারা হল পৌণ্ড্রযোদ্ধা। এখনকার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পূর্বপুরুষ। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্ম প্রভৃতি রাজ্যগুলো থেকে নানা জাতির মানুষ এখানে এসে মিলেছিল। এদের সমন্বয়ে একটা মহাজাতি গড়ে উঠেছিল। বিদেশিরা তার নাম রেখেছিল নেশন অব গঙ্গারিডি। ধর্মান্তরিত মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আদিবাসী প্রভৃতি বহু নামের বাঙালি অর্থাৎ অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গল ও বৈদিক আর্যদের নিয়েই আজকের এই বাঙালি মিশ্রজাতিসত্তা গড়ে উঠেছে। গৌরবোজ্জ্বল গঙ্গারিডিদের উত্তরাধিকারী আমরাই। আমি সেই পুরনো ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই। জয় শ্রীগঙ্গা।

কী করে করবেন! বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে তা কি আর সম্ভব হবে ?

হবে। পুরনো ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনকে তুলে ধরতে হবে। শাস্ত্রসম্মত জীবন-যাপন করতে হবে। জয় শ্রীগঙ্গা!

কথাগুলো শুনছিল বদ্রীও। বদ্রী বুঝল, চন্দ্রনাথ বর্ধনকে দেখতে যতই কুৎসিত-কদাকার হোক না কেন, লোকটা সাঙ্ঘাতিক রকমের মানসিক শক্তির অধিকারী। নিজের গড়ে তোলা চিন্তা-ভাবনা আর বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাঙ্ঘাতিক রকমের অবিচল।

স্টেট অব গঙ্গারিডির চেহারাটা কেমন হবে?

আদি গঙ্গার মোহনা অঞ্চলেই গঙ্গারিডিদের মূল বাসভূমি ছিল। সারা গঙ্গোপদ্বীপ অর্থাৎ উপবঙ্গ ছিল গঙ্গারিডি জাতির রাষ্ট্র। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ছিল আমাদের এই পূর্বপুরুষদের। মেগাস্থিনিস এবং থিওডোরাস তাঁদের ভারত ভ্রমণের কাহিনীতে বলেছেন, কোন বিদেশি শক্তিই গঙ্গারিডিদের হারাতে পারেনি। অনুমান করা যেতে পারে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ঠেকাতে এরা মগধের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছিল।

বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও সাযুজ্য আছে কি?

অব কোর্স! বিনা প্রমাণে চন্দ্রনাথ বর্ধন কোন কথা বলে না। মেগাস্থিনিস আর থিওডোরাসের বইপত্র ঘেঁটে আপনি দেখতে পারেন। গঙ্গারিডিদের নিজস্ব রাজধানী ও সেনাবাহিনী ছিল। মগধের নন্দবংশ বা পরে মৌর্যসম্রাটরা গঙ্গারিডিদের বশে আনতে পারেননি বা চেষ্টাও করেননি।

গঙ্গারিডিরা তাহলে এখন কোথায় গেল?

সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাবাত্যা, বন্যা এসবের ফলেই গঙ্গারিডিদের রাজধানী গঙ্গানগর, বন্দর—গঙ্গাবন্দর সব ধ্বংস হয়ে গেছে। গঙ্গারিডি-সভ্যতার প্রচুর নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের নানা জায়গায়।

সেসব কি আপনি নিজে গিয়ে দেখেছেন?

অবশ্যই! শুধু দেখেছি, তাই নয়। এসব যে গঙ্গারিডি মহাজাতির, তার সমস্ত প্রামাণ্য তথ্যাদি জোগাড় করেছি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বানভট্টের হর্ষচরিত, মেগাস্থিনিস, থিওডোরাসের ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্ত কিছু ঘেঁটে এর সারবত্তা প্রমাণ করেছি। টলেমির লেখাতেও এর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

মানলাম, বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে একসময়ে অনেক মানুষ বাস করত। কিন্তু এখন তা পরিত্যক্ত। জনমানুষহীন। ভাটিদেশ। এখন এখানে বিরাট বন তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমি গতবার সুন্দরবনে গিয়ে জেনেও এসেছি, বন রক্ষা করতে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ প্রকল্প করা হয়েছে। কলকাতা

বন্দর এবং শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ রক্ষায় এই বনকে বাঁচিয়ে রাখারও দরকার আছে।

কথাটা শুনে চন্দ্রনাথ বর্ধন চুপ করে রইল। ওর অদ্ভুত চোখদুটো দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছে। বদ্রী চন্দ্রনাথ বর্ধনকে লক্ষ্য করছিল ভালো করে। ও নিজের সমস্ত মনোযোগকে একত্র করে চন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা বুঝে নিতে চাইছিল। ওর মনে হল, চন্দ্রনাথ নিজের মনের কথা আড়াল করছেন। একটা বাঁকানো রিংয়ের মতো কুটিলতার তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন চন্দ্রনাথের সারা শরীরে। চন্দ্রনাথ যে চেয়ারটায় বসেছিল, তার পেছনেই একটা বড় মাপের আয়না ঝুলছিল দেওয়ালে। বদ্রী এতক্ষণ ওর পেছনদিকের দেওয়ালটার দিকে তাকায়নি। আয়নার প্রতিবিম্বে ও একটা পরিচিত দৃশ্য দেখতে পেল। সুন্দরবনের একটা খাঁড়ি। দুপাশে গভীর বন। সবকিছু ছাপিয়ে একটা বাঘের মুখ সারা দেওয়াল জুড়ে। বাঘটাকে অদ্ভুত দেখতে। না বাঘ, না মানুষ! নীল আর লাল রঙের মিশ্রণে চোখদুটো আঁকা। আয়নার প্রতিবিম্বেই বদ্রী দেখতে পেল, উল্টোদিকের দরজাটা সামান্য ফাঁক হল। ঘরের ভেতরে একজন লোকের পেছন দিকটা দেখা গেল। চন্দ্রনাথবাবু বলল, জগন, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ? জগনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—'হ্যাঁ, বাবু।' আয়নার প্রতিবিম্বে বদ্রী লোকটার ঠোঁট নাড়া দেখতে পেল। বদ্রী সার্চলাইটের মতো চোখ নিয়ে আয়নার দিকে দেখছে এখনও। লোকটা সামান্য ঘুরল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে একপলক ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বদ্রীর সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। না। বদ্রীর কোন ভুল হয়নি। সেই চোখ! যে চোখজোড়া কিছুদিন আগে সুন্দরবন অভিযানের সময় থেকেই ওদের অনুসরণ করছে। বদ্রীর শরীরটা কেঁপে উঠল অজানা আশঙ্কায়। চন্দ্রনাথ বর্ধন এতক্ষণ গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল। কেদার মুজমদার বদ্রীর ভাবান্তর দেখছিলেন। ইশাবায় প্রশ্ন ছুঁড়লেন কেদার। বদ্রী ইশারায় দরজার দিকটা ইঙ্গিত করল। কেদার ঝট করে ঘুরে তাকালেন। দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে বের হবার দ্বিতীয় দরজাটা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

কী ভাবছেন কেদারবাবু? তাহলে আমি কী করতে চাই? প্রথমত আমি কতকগুলো জায়গা অনুসন্ধান করতে চাই। যেগুলো আমি দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়ে মার্ক করেছি। কিন্তু একার পক্ষে আমার সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার সাহায্য চাই। আপনি অভিজ্ঞ লোক। আমার অনুসন্ধান কাজে আপনাকে রাখতে চাই। আপনার প্রাপ্য পারিশ্রমিক আপনি পাবেন। এ ব্যাপারে

আমি দরকষাকষিতে যাব না। ইনক্লুডিং আপনার সহযোগী, আপনি যা চাইবেন, আমি সেটাই পে করব। অর্ধেক টাকা আমি আগাম দিয়ে দেব।

ঠিক আছে। আমি আপনাকে দু'দিনের মধ্যে জানাব। তাহলে আজকে আমরা উঠি?

থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার সহযোগিতার অপেক্ষায় রইলাম। জয় শ্রীগঙ্গা!

রাস্তায় নেমে কেদার বদ্রীকে বললেন, বিদেশিদের সঙ্গে চন্দ্রনাথ বর্ধনের দহরম-মহরমের কথা কনফিডেন্টলি বললাম কী করে বল তো?

কী করে?

এর আগে যেদিন ওর বাড়ি এসেছিলাম, ঠিকানা খুঁজতে পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম। পাড়ার লোকজনই বলল। আচ্ছা বল তো বদ্রী। আমি এই কেসটা নেব কি নেব না?

আপনি মনে মনে ডিসিশন করে ফেলেছেন, কেসটা হাতে নেবেন।

বাঃ। কিন্তু কেন নেব?

চন্দ্রনাথ বর্ধন সম্পর্কে আপনার সাঙ্ঘাতিক কৌতূহল জন্মেছে। ওর জীবন যাপন এবং কথাবার্তার মধ্যে যথেষ্ট রহস্য রয়েছে। এটাও একটা কারণ।

ফাইন! এবার তুই বল। এতক্ষণ অবজারভেশন করে কী বুঝলি?

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে।

সাঙ্ঘাতিক মানে?

সেই লোকটা।

কোন্ লোকটা?

সেই যে রহস্যময় চোখ! মনে নেই? গতবার সুন্দরবন অভিযানে যাবার আগে বাগবাজার থেকে আমাদের ফলো করছিল। ক্যানিং থেকে লঞ্চে ওঠার পরেও সেই লোকটাকে দেখেছিলাম আরেকটা লঞ্চে।

সে মনে থাকবে না কেন!

সেই লোকটাকে দেখলাম আপনার এই চন্দ্রনাথের ভেতরের ঘরে।

বলিস কী! —কথাটা শুনে কেদার মজুমদার উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলেন। কখন দেখলি? আমি তো দেখলাম না!

চন্দ্রনাথ বর্ধনের পেছনে একটা আয়না ছিল। আয়না দিয়ে উল্টোদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। একপলকেই দেখে নিয়েছি। লোকটার নাম কী জানেন?

কী নাম?

জগন।

জগন। —কেদার ভাবলেন এক মুহূর্ত। ও, চন্দ্রনাথ ওই নাম ধরেই

তো ভেতরে কথা বলছিল। ইউরেকা! শুরুতেই রহস্য! কেস হাতে নিলাম। সাবাশ বদ্রী! শুরুতেই তোমার খেল।

দুই

শনিবার সন্ধ্যা সোয়া সাতটা। কলকাতার পথেঘাটে রূপসী সন্ধ্যা আলোর গয়না পরে নিজেকে দেখাতে ব্যস্ত। কোন কোন রাস্তায় বিরামহীন মানুষের স্রোত চলছেই। শনিবার বেশিরভাগ সরকারি অফিস বন্ধ থাকে। অনেক অফিস দুপুরেও ছুটি হয়ে গেছে। তাই ট্রাম-বাস একটু ফাঁকা। উত্তর কলকাতার দিক থেকে একটা ছয় নম্বর ট্রাম এসে থামল কলেজ স্ট্রিট মোড়ে। দশ-বারো জন নামল ট্রাম থেকে। এর মধ্যে একজনের আচরণের মধ্যে একটু অস্বাভাবিকতা দেখা গেল। কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়টা ক্রস করলেই এখন একটু অন্ধকার। লোকটা সন্দেহজনক চোখে চারপাশটা দেখে মোড় পেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের সামনে চলে এল। এই জায়গাটা একটু নির্জন। আজ শনিবার ফুটপাথের বইয়ের দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। হাতবিশেক দূরে বাসস্ট্যাণ্ডে দু'তিনজন মহিলাসহ ট্রাম-বাস ধরার জন্য কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কোত্থেকে বেঁটেমতো আর-একটি লোকের উদয় হল। কি গঙ্গু! ওরা আছে এখানে?

জী জগন সাহেব।

কোথায়?

বেঁটে লোকটা তর্জনি তুলে অ্যালবার্ট হলটা দেখিয়ে দিল।

ঠিক আছে। তোমরা গাড়ি নিয়ে তৈরি থেকো। মছলি দেখলেই ছিপ ফেলবে। আমার সবকিছু নজরে থাকবে। সমঝা!

হাঁ, সমঝু। ওইসি ই হো যায়েগা।

অ্যালবার্ট হল কফি হাউস তখন হই-হট্টগোলে মাতোয়ারা। প্রত্যেক টেবিলেই ভিড়। শনিবার সন্ধ্যায় অনেকেই একটু হাতে সময় পায়। তাই গুলতানির নেশাটাও জমে ভালো। বিচিত্র রকম মানুষের ভিড়ে কফি হাউস গমগম করছে এখন। হাউসের তিনতলাটায় তুলনামূলকভাবে ভিড় কম। তিনতলায় দরজার বিপরীতে ব্যালকনির শেষ মাথায় নিরিবিলিতে বসেছিলেন কেদার মজুমদার। সঙ্গে ছিল বদ্রীনারায়ণ এবং আর একজন ভদ্রলোক। সামনে টেবিলে তিনটে কাপে কালো কফি। ওয়েটার একপ্লেট পকোড়া দিয়ে গেল।

একটা পকোড়া মুখে ফেলে চিবোতে চিবোতে কেদার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই হল ব্যাপার ব্রতীনবাবু। এ ব্যাপারে যদি আপনার কিছু জানা থাকে, তো বলুন। বিষয়টা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

কেদার মজুমদারের মুখোমুখি বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন, যেটা আপনি জেনেছেন, সেটা ঠিকই। বিশ্বের নবম বায়োস্ফিয়ার বা জীবপরিমণ্ডল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সুন্দরবনের অরণ্য অঞ্চলকে। এই বন রক্ষার জন্য নানাভাবে কাজ চলছে, সে তো আপনি জানেনই। এর ফলে সুন্দরবনের প্রকৃতি বা গ্রাম-জনপদের গুণগত পরিবর্তনও ঘটেছে।

এই ব্যাপারটা আমি জেনেছি। আমি শুধু সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে চাইছি।

হাঁ। সেটাই বলতে চাইছি। আমরা গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র-আত্মীয়সভা নামে একটি সংস্থা করেছি। সংস্থা এই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করছে। বহু বছর আগে আন্তর্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্র ও বন্দর হিসাবে ভাগীরথী-সাগর সঙ্গম এলাকা বিশ্ববিখ্যাত ছিল বলেই জানা গেছে। গ্রিক, রোমান, মিশর এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের লেখায় গঙ্গারিডিদের কথার উল্লেখ আছে।

তাহলে বিষয়টা কাল্পনিক নয় বলছেন ?

না। কাল্পনিক নয়। আমরা চন্দ্রকেতুগড়ের একটা প্রচীন মুদ্রা উদ্ধার করেছি। প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের খরোস্টি-ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধারও করা গেছে। লিপিতে 'গণরঝদ' কথাটা উৎকীর্ণ আছে। 'গণরঝদ' 'গণরাজ্যাৎ' থেকেই এসেছে। খুব সম্ভবত গঙ্গারিডিরা গণরাজ্যই প্রতিষ্ঠা করেছিল। গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করত তারা। মগধ, কলিঙ্গ তাম্রলিপ্তের সঙ্গে গঙ্গারিডিরা গড়ে তুলেছিল সম্মিলিত বন্ধু রাষ্ট্র। যাকে কনফেডারেশন বলা যেতে পারে। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বিশাল গজবাহিনীও এদের ছিল খুব সম্ভবত। আলেকজাণ্ডার খবর পেয়েছিলেন এই গজ বাহিনীর। এই ভয়ে তিনি আর মগধ আক্রমণ করেননি। বিপাশা নদীর ওপার থেকেই ভারতবর্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। অশোকের শিলালিপি পড়ে আমরা আর একটা জিনিস জানতে পেরেছি।

কী সেটা ?

এইসব অঞ্চলে রাজ্যগুলিতে তখন সমবায়িক বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যস্থাই চালু ছিল। ভলতেয়ারের প্রাচ্যদেশিয় উপন্যাস 'জাদিগ' অথবা নিয়তিতে সান্ধ্যভোজ অধ্যায়ে 'গঙ্গারিডির এক ভারতীয়' কথাটি পাওয়া যায়।

বুঝলি বদ্রী। একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। চন্দ্রনাথবাবু কিন্তু গঙ্গারিডিদের সম্বন্ধে সবটা আমাদের বলেননি।

কোন্ দিকটা বলেননি বলছেন?

এই যে ব্রতীনবাবু যেটা আমাদের বললেন। ব্রতীনবাবুরাও সুন্দরবনের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে। যেটা মিউজিওলজির একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট হতে পারে।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু কোন দিকটা আপনাকে বলেননি?

বলছি বলছি। সেটা হচ্ছে গঙ্গারিডির গণতান্ত্রিক সমবায়িক রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে। চন্দ্রনাথ বর্ধন শুধু গঙ্গারিডি জাতিসত্তার আবেগ তুলে অসুস্থ উন্মাদনা তৈরি করতে চান। সেই অর্থে এই অঞ্চলের পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার বা খননের তেমন পক্ষপাতি নন উনি। গঙ্গারিডিরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলায় উনি কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্য করেছিলি তো?

তা খেয়াল করেছি। আপনি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

কী বল তো?

জয় শ্রীগঙ্গা শব্দটা। এ তো বিজ্ঞানের যুগে জোর করে প্রাচীনত্বের ছাপ্পা মেরে দেওয়া।

বদ্রীর কথাটা শুনে কেদার দারুণ খুশি হলেন। ব্রতীন শিকদারকে লক্ষ্য করে বললেন, বুঝলেন ব্রতীনবাবু। বদ্রী আমার চিন্তার ক্ষেত্রে অর্ধেক কাজ এগিয়ে রাখে। চন্দ্রনাথ বর্ধন বারেবারেই জয় শ্রীগঙ্গা কথাটা উল্লেখ করছিল। গঙ্গারিডি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে উনি বোরগে 'জ'-এর ওপর অ্যাকসেণ্ট দিয়ে প্রায়শই এই কথাটা বলছিলেন।

তাতে কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। তবে চন্দ্রনাথ বর্ধনের মনোবাসনাটা যেহেতু আমরা খানিকটা বুঝে ফেলেছি, তাই এই শব্দটা উচ্চারণের একটা সাইকোলজিক্যাল বিশ্লেষণও করতে হবে। এবং সেটা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট।

বলুন!

ব্রতীনবাবু, আপনারা পুরাতাত্ত্বিক সংগ্র :হর কাজ করছেন। সেক্ষেত্রে প্রাচীন ওই রাষ্ট্র সম্পর্কে আরও বেশি প্রমাণ খুঁজবেন, প্রাচীন জিনিসপত্র খুঁজে বের করে তার যুক্তিকে মজবুত করার ওপরই জোর দেবেন। এটাই তো স্বাভাবিক! তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বর্ধনের কথাবার্তার মধ্যে এক ধরনের ডিক্টেটরের নির্দেশ লুকিয়ে থাকছে। 'আমি যা বলছি তাই ঠিক।' 'এটাই হবে।' 'এটাই করব।'—এই ধরনের আর কী! এবং নিজের কথা এস্টাব্লিশ করার ক্ষেত্রে যুক্তির অভাব হলেই উনি জয় শ্রীগঙ্গা বলে চেঁচিয়ে ওঠেন। এটা হচ্ছে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুপার ইগো কমপ্লেক্স বলা যেতে পারে। এইসব মানুষ সমালোচনা মেনে নিতে পারে না। যুক্তি-বুদ্ধি ছাড়িয়ে এরা অবদমনের আশ্রয় নেয়। তখনই জয় শ্রীগঙ্গা—এই জাতীয় কথা বলে নিজের মতামতকে জোর করে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বদ্রীনারায়ণ কেদারদার কথা একমনে শুনছিল। ও চন্দ্রনাথ বর্ধনকে ভাবছিল। লোকটার ভঙ্গি, কথা বলার বৈশিষ্ট্য, চোখের চাহনি—সব কিছু স্মৃতি থেকে টেনে এনে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। আর মেলাবার চেষ্টা করছিল কেদারদার বিশ্লেষণের সঙ্গে। বদ্রীনারায়ণ ডুব দিল চেতন-অবচেতন চিন্তার গভীরে। কয়েক মিনিটের জন্য কফি হাউসের হই-হট্টগোল আর মানুষজনের কাছ থেকে ও চলে গেলো অনেক দূরে। বদ্রীর দ্বিতীয় মনের মধ্যে উথালপাথাল শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ বর্ধনকে ঘিরেই এই উথালপাথাল ঢেউ। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা আবার ধীরে ধীরে কমতেও শুরু করল। ক্রমশ। অবচেতনের আড়াল থেকে বদ্রী ফিরে এলো চেতনায়। ওর চোখ চলে গেল নিচে। এই টেবিল-ওই টেবিল করতে করতে দরজার কাছে। বদ্রীনারায়ণের সারা শরীরে শিহরন। নিচে দরজার মুখে জগন। জগন টেবিলগুলোয় কাকে যেন খুঁজছে। ওরা যে ওপরে আছে, সেটা বোধ হয় জগন ভাবেনি। বদ্রীনারায়ণ দ্রুত ওর সাইডব্যাগ থেকে একটুকরো কাগজ বের করে পেন দিয়ে তাতে দুটো কথা লিখে কেদারের হাতে দিল। কেদার দেখলেন, তাতে লেখা আছে—'জগন কফি হাউসে ঢুকেছে। আমাদের খুঁজছে।'

লেখাটা পড়ে কেদার মজুমদার সামান্য হাসলেন। বদ্রীকে ইশারায় শান্ত থাকতে বললেন। ব্রতীন শিকদার বদ্রীর ভাবান্তর লক্ষ্য করছিলেন। কেদার সেটা লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের বদ্রী একটু মুডি ছেলে। বুঝলেন ব্রতীনবাবু! তবে ও যথেষ্ট চিন্তাশীল। যাই হোক, আপনার কাছ থেকে ম্যাপটা পাচ্ছি আমি?

হ্যাঁ, আমরা বহু খেটে এই ম্যাপ তৈরি করেছি। ম্যাপের মার্ক করা জায়গাগুলোতে আমরা গিয়েছিলাম। কোথাও কোথাও খনন-কাজও চালিয়েছি। কোন কোন জায়গা দুর্গম বলে আমরা সেখানে পৌঁছতে পারিনি।

এই যে দেখুন, সেইসব জায়গায় লাল কালি দিয়ে গোল চিহ্ন দেওয়া আছে। এইসব জায়গায় আমরা পৌঁছতে পারিনি। এই যে দেখুন! এই এলাকাটা সুন্দরবনের কোর এরিয়ার মধ্যে পড়ে। কথিত আছে, মহারাজ চন্দ্রকেতুর কোষাগার ছিল এখানে। তবে আমরা নানাভাবে অনুসন্ধান করে যা বুঝেছি, গুপ্তধন বলে এখানে কিছু নেই। তবে একটু পরিশ্রম করলে সাঙ্ঘাতিক সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এখান থেকে উদ্ধার করা সম্ভব, যা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কাছে লাখ লাখ টাকার সমান। ইতিহাসবিদের কাছে তা সোনার চেয়েও দামি।

বদ্রী এবার আর-একটা চিরকূট দিল কেদার মজুমদারের হাতে। কেদার লেখাটা পড়লেন, 'আমাদের টেবিলের দুটো টেবিলের পরের টেবিলটায় বসে থাকা বেঁটে কালোমতো লোকটা আড়চোখে বারবার আমাদের দেখছে।'

কেদার মজুমদার এবারও হাসলেন। তারপর বদ্রীকে বললেন, বদ্রী! তোর সাইডব্যাগটা দে। ব্রতীনবাবুর ম্যাপটা তোর কাছেই থাক। তারপর ওয়েটারকে ডেকে বললেন, আমাদের আরও তিনটে ইনফিউশন দিয়ে যাও তো ভাই!

এরপর কেদার আলোচনার বিষয় পাল্টে শিল্প-সাহিত্য-সিনেমা থিয়েটার নিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলেন। পৌনে ন'টায় হাউসের আলো নিভতে শুরু করল। তিনজনই উঠে পড়ল। সকলেই বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। ওরা বাইরে এল। বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ফাঁকা হয়ে গেছে। ওরা ব্রতীনবাবুকে ধর্মতলার ট্রামে তুলে দিল। এবার কেদার বললেন, বদ্রী, তোর সঙ্গে শিয়ালদা-মির্জাপুর পর্যন্ত যাই। ওখান থেকে আমি শ্যামবাজারের বাস ধরে নেব। তুই তো হেঁটেই ডিকসন লেনে চলে যেতে পারবি।

তাই ভালো।

ওরা ট্রামলাইন পেরিয়ে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের মুখে আসা মাত্রই উল্টোদিক থেকে একটা প্রাইভেট কার প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষে ওদের সামনে দাঁড়াল। গাড়ির পেছনের দুটো দরজা খুলে দু'জন লোক বেরিয়ে এসেই বদ্রীকে ধরে জোর করে গাড়িতে ঢোকানোর চেষ্টা করল। বদ্রী চিৎকার করে ডাকল—কেদারদা!

কেদার মজুমদারের হতভম্ব ভাব কাটতে এক সেকেণ্ডও লাগল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি সামনের লোকটার পেছনে সব শক্তি জড়ো করে এক লাথি হাঁকালেন। আর্ত চিৎকার করে লোকটা উল্টে পড়ল নর্দমার ধারে। পড়েই গোঙাতে লাগল। ততক্ষণে বদ্রী হাত ছাড়িয়ে রাস্তায়। এদিকে গাড়ির সামনের

বাঁদিকের দরজা খুলে একজন হৃষ্টপুষ্ট ষণ্ডামার্কা লোক বেরিয়ে এসেছে। হাতে ছুরি। কেদার মজুমদার হলেন ইয়েলো বেল্ট ক্যারাটে মাস্টার। প্রয়োজনে ওঁর চোখের দৃষ্টি হয়ে যায় বিদ্যুতের মতো। উনি পজিশনটা দেখে নিলেন। তারপর লাফ দিয়ে দ্বিতীয় লোকটার মারমুখী ডানহাতটা কুমফুর প্যাঁচে ঘুরিয়ে দুটো হাত পিছমোড়া করে ফেললেন। ছুরিহাতে তৃতীয় লোকটা এগিয়ে আসা মাত্রই দ্বিতীয় লোকটাকে দুহাতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন সেদিকে। ছুরিহাতে লোকটা তৎপর। সে ঝট করে সরে গেল। দ্বিতীয় লোকটার পিচ রাস্তায় আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভাঙার অবস্থা হল। বদ্রী তখন চিৎকার শুরু করেছে। আশপাশ থেকে দু-চারজন ছুটে আসছিল। তখনই ট্রামলাইনের ওপর বিকট শব্দে দু'টো বোমা পড়ল। ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে গেল চারদিক। লোকজন থমকে দাঁড়াল। কেদার পলকে পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে একলাফে বদ্রীর কাছে চলে এলেন। তারপর ধোঁয়ার মধ্যেই বদ্রীকে নিয়ে আন্দাজ করে কফি হাউসের গেট বরাবর ছুটে গিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। পরমুহূর্তেই বদ্রীর দাঁড়িয়ে থাকা আগের জায়গায় আর-একটা বোমা পড়ল। কেদারদা বললেন, দেখেছিস ! ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম।

বদ্রী বলল, কেদারদা, সাইডব্যাগটা হাওয়া। তবে গাড়ির নম্বরটা মনে আছে।

প্রাইভেটকারটার স্টার্টের আওয়াজ হল। ধোঁয়ার মধ্যেই ওটা ট্রামলাইনে উঠে দক্ষিণমুখী ছুটল। কেদারদা বললেন, বদ্রী, চল, এই তালে সট্‌কে পড়ি। পুলিস এলে জবাবদিহি করতে করতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

এদিকে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বহু লোক জমে গেছে। ধোঁয়ার ভেতরেই কেদার বদ্রীকে নিয়ে এলাকাটা পেরিয়ে এলেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মুখে দুজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা ?

ওইসব সাট্টাওয়ালাদের ঝামেলা ! লোকদু'টো চলে গেল। কেদার বদ্রীকে বললেন, বুঝলি ! কলকাতা হল গুজবের শহর। আমার এই কথাটাই দেখবি ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে গেছে।

কেদার মজুমদার বদ্রীকে নিয়ে চুপচাপ হেঁটে মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের মুখে চলে এলেন। ভেতর ভেতর প্রচণ্ড টেনশন থাকলেও দুজনকে দেখে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। শিয়ালদামুখী একটা কুড়ি নম্বর ট্রামে ওরা উঠে পড়ল। নামল এসে এন আর এস হসপিটালের সামনে। কেদার এবার জিজ্ঞেস করলেন, বদ্রী, কোথাও লেগেছে ?

না, একটুও না।

নার্ভাস হোসনি তো?

একেবারেই না।

তাহলে ওদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে নিই। কী বলিস?

অ। ইয়াস।

চল্ তাহ'লে।

ওরা দু'জন এন আর এস হসপিটালের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বাঁদিকে অনেকগুলো পাবলিক টেলিফোন বুথ। কেদার মজুমদার একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। একটা কয়েন ফেলে দিলেন। ওপারে রিং বাজল। হ্যালো।

হ্যালো!

এটা কি চন্দ্রনাথ বর্ধনের বাড়ি?

হ্যাঁ। আমি চন্দ্রনাথ বর্ধন কথা বলছি।

আমি কেদার মজুমদার বলছি।

আ রে কেদারবাবু! কী খবর! অসময়ে এই অধমের খোঁজ!

আপনার কেসটা হাতে নিলাম।

বাঃ বাঃ। থ্যাঙ্ক ইউ। তাহলে ফাইনালি কথা হয়ে যাক!

হ্যাঁ। সেটা টেলিফোনে নয়। মুখোমুখি। ছাড়ছি তাহলে!

আচ্ছা, ও কে।

ও কে।

বদ্রীনারায়ণ এবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কেদারদা, ম্যাপটা যে খোয়া গেল!

ম্যাপ যথাস্থানেই আছে। ওরা তোর সাইডব্যাগটায় ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ পাবে। এটা হচ্ছে কেদার মজুমদারের হাত-সাফাইয়ের সামান্য নমুনা। নে, আর দেরি করিস না। ঝটপট মেসে ঢুকে পড়। আমি একটা বাস ধরে শ্যামবাজার চলে যাবোখন।

তিন

একটা জিপ ভাড়া করা হয়েছিল। জিপে করে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে ওরা তিনজন বুধবার সকালে রওনা দিল সোনাখালির দিকে। সোনাখালির ওপারেই বাসন্তী। বাসন্তীতে একটা লঞ্চ রেডি থাকবে। চন্দ্রনাথবাবুই ঠিক করে রেখেছেন। সেখান থেকেই নদীপথে সুন্দরবনের ভেতরে যাওয়া হবে। পথে

তেমন কোন ঘটনা ঘটল না। কেদার মজুমদার, চন্দ্রনাথ বর্ধন আর বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি—এই তিনজনের দলটি বেলা সোয়া এগারোটায় সোনাখালি পৌঁছল। সোনাখালি বাসরাস্তা থেকে সোনাখালি লঞ্চঘাট। ওখান থেকে নৌকায় ওপারে বাসন্তীতে। বাসন্তীতে একটা হোটেলে ওরা খেয়ে নিল। ওদিকে লঞ্চে সপ্তাহখানেক চলার মতো রসদ তোলা হচ্ছিল। দেখে বদ্রীর গতবারের সুন্দরবন অভিযানের কথা মনে পড়ল। সেবার ওরা বাঘের চামড়ার চোরাচালানকারীদের ধরে হইচই ফেলে দিয়েছিল। প্রায় একই দৃশ্য এবারও। সেবার ক্যানিং থেকে। এবার সোনাখালি থেকে। এই যা পার্থক্য। বদ্রীর মনটা বেশ খুশি-খুশি লাগছিল। কেদারদা, আবার সেই সুন্দরবনে। সেই একই ব্যাপার। তাই না!

তফাৎ একটা আছে। সেবার ছিল সরকারি সফর। এবার বেসরকারি। তবে সরকারি অনুমতিপত্র সবই মজুত। চন্দ্রনাথ বর্ধনের এদিকে কোনও ঘাটতি নেই।

চন্দ্রনাথ বর্ধন তখন ডেকের ওপরে হুইলরুমের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকিয়েছিলেন সোনাখালির জেটির দিকে। মনে হচ্ছে উনি কারুর প্রতীক্ষা করছিলেন। এদিকে লঞ্চ ছাড়বার জন্য রেডি। তবুও চন্দ্রনাথ বর্ধন লঞ্চ ছাড়বার কথা বলছেন না। এদিকে বদ্রী তার অবজার্ভেশনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বদ্রী ঘুরে ঘুরে সব দেখে নিচ্ছিল। গতবারের লঞ্চটা ছিল ওয়েল ডেকরেটেড। এবারকারটা তা নয়। লঞ্চের নাম এম ভি গঙ্গা। গড়ন মোটামুটি একই রকম। দুটো বাথরুম নিচে। একটা ওপরে, পেছনের দিকে। ভেতরে ডাইনিং স্পেস। ইঞ্জিনঘরটা বেশ খোলামেলা! লঞ্চটা পুরনো পুরনো দেখতে হলেও বদ্রী লক্ষ্য করল ইঞ্জিন একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ। এবং শক্তিশালী। ওপরে সারেঙের ঘরের পেছন দিকে যথারীতি একটা কেবিন রয়েছে। দুটো কেবিন নিচে। লঞ্চের সামনের দিকে মুখ করলে ডানদিকের কেবিনটা কেদার মজুমদার আর বদ্রীর জন্য বরাদ্দ। বাঁদিকেরটায় থাকবেন চন্দ্রনাথ বর্ধন। অবশ্য চন্দ্রনাথবাবু বলেছিলেন, বদ্রী অনায়াসে হুইলরুমের পেছনের কেবিনটায় থাকতে পারে। কেদার মজুমদার রাজি হননি। উনি বলে দিয়েছেন, না, বদ্রী আমার সঙ্গেই থাকুক আপাতত। বদ্রী সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল। কেবিনে একটা করে লাইট। ব্যাটারি-কানেকশনগুলোও ভালো করে দেখে নিল। জানালা-দরজার লক্‌গুলো ঠিকই আছে। ওরা সবাই ওপরের ডেকে বসেছিল। বদ্রী এই ফাঁকে সবগুলো কেবিনের বেডের তলাগুলো দেখে নিল। বাথরুমের জলের পাইপ, ইঞ্জিন-ঘরের তেলের ট্যাঙ্কার, জলের ড্রাম সবকিছু। এবার ও ঝট করে

ওপরে উঠল। দেখল, কেদারদা বাঁদিকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাঁদিকের রেলিঙের পাশে চন্দ্রনাথ বর্ধন সোনাখালির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কেদারদা বদ্রীকে আস্তে করে বললেন, এই ফাঁকে চন্দ্রনাথ বর্ধনের ঘরটা ভালো করে দেখে নে। সন্দেহজনক কিছু পেলে খেয়াল রাখবি। ওর মতলবটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তার ওপর ওইসব সন্দেহজনক লোকগুলোকে ওর বাড়িতে দেখে আমার সন্দেহটা আরও বেড়েছে।

কিন্তু ও আমাদের সঙ্গে নিচ্ছে কেন? সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ। সেটা ও আজকে ডিটেলে বলবে বলেছে। যা, এই ফাঁকে তুই ওর কেবিনটা ভালো করে দেখে নে। অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা দেখে নিবি। আর সন্দেহজনক কাগজপত্র—

চন্দ্রনাথ বর্ধনকে এদিকে তাকাতে দেখে কেদার দ্রুত প্রশ্ন ছুঁড়লেন, আপনাদের লঞ্চ কখন ছাড়বে? আমরা তো বোর হয়ে যাচ্ছি।

খানিকক্ষণ বাদেই চলতে শুরু করবে।

বদ্রী চন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করছিল। লাল আর নীলের অদ্ভুত সংমিশ্রণে ওর চোখদুটো যেন সব সময়ই জ্বলছে। আজকে একটা গেরুয়া রঙের ঢোলা পায়জামা আর একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। কপালে একটা বড় লাল টিপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তবে সেদিন যেমন ওকে উদ্ভট লাগছিল, আজকে তুলনায় ভালো দেখাচ্ছে।

বদ্রী নিচে নেমে গেল। নেমে সোজা ঢুকে পড়ল চন্দ্রনাথের কেবিনে। বেডের পাশে একটা শেল্ফ। শেল্ফে কিছু কাগজপত্র রয়েছে। তার মধ্যে একটা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা। তিনটে সুন্দরবন সম্পর্কিত বই। কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ। না, গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু নেই। বদ্রী বেডের নিচের দিকে তাকাল। একটা কাঠের পেটির ওপর চন্দ্রনাথের ঝোলাটা রাখা আছে। ঝোলায় রয়েছে একটা কমণ্ডলু, একটা চিমটে আর গাঁজা খাওয়ার কলকে। ঝোলা থেকে গাঁজার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। তবে সন্দেহজনক কিছুই নেই। কাঠের পেটির পেছন দিকে বদ্রীর নজর গেল। কতকগুলো কাগজপত্র বাঁধা দড়ি দিয়ে বাণ্ডিলটা তুলল বদ্রী। দড়ির গিঁটটা খুলল। কতকগুলো দলিল-দস্তাবেজ। বদ্রী দলিল-দস্তাবেজগুলো খুব সাবধানে ভাঁজে ভাঁজে উল্টে দেখতে লাগল।

এদিকে ওপরে কিছু একটা দেখে চন্দ্রনাথ বর্ধন নড়েচড়ে বসেছে। দেখা গেল, ওপারে সোনাখালি জেটিতে একটা লঞ্চ এসে ভিড়ল। লঞ্চের নাম

এম ভি চন্দ্রকেতু। লঞ্চের নিচের কেবিনের জানালা থেকে কে একজন হাত নাড়ল এম ভি গঙ্গার দিকে। কেদার টোটাল ব্যাপারটাই আড়াল থেকে দেখে নিলেন। চন্দ্রনাথবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, এবার আমরা রওনা হতে পারি।

কেদার মজুমদারও দ্রুত নিচের দিকে মুখ করে ডাকলেন, বদ্রী! ওপরে চলে আয়। লঞ্চ ছাড়ছে!

বদ্রী বুঝে নিল কেদারদার সঙ্কেত। দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে রেখে ও বেরিয়ে এল চন্দ্রনাথ বর্ধনের কেবিন থেকে। তারপর সোজা ওপরে। ওপরে তখন আশ্চর্য দৃশ্য। তিনবার ভোঁ বাজিয়ে এম ভি গঙ্গা ছেড়ে দিয়েছে। বাসন্তীর পাড় থেকে লঞ্চ ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সূর্য এখন মাথার ওপর। নদীর ছোট ছোট ঢেউয়ে রোদ্দুরের রুপোলি কণা খেলা করছে তা-থৈ তা-থৈ করে। ওপাশে সোনাখালি। এপাশে বাসন্তী। দুপাশে দুই জনপদকে রেখে লঞ্চ ছুটে চলেছে অরণ্যের দিকে। জীবনানন্দ দাসের কয়েকটা পংক্তি মনে পড়ল বদ্রীব। কেদারদাকে শুনিয়েই ও উচ্চারণ করল, —'গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি/বীজের ভেতর থেকে কী করে অরণ্য জন্ম নেয়,—/জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর/কী করে এ-প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা/ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল/আমরা জেনেছি সব,—অনুভব করেছি সকলই।'

কেদারদা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, ফাইন! বদ্রী, ফাইন!

চন্দ্রনাথ বর্ধনও শুনছিল কবিতা। এবার কেদার ধরলেন, 'সূর্য জ্বলে,—কল্লোলে সাগর জল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই/শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন/আমাদের শরীরের সিন্ধু-তীর/এইসব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন/জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে/সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা/সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে/সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি/সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।'

বদ্রী অবাক। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেদার মজুমদারের মুখে জীবনানন্দ দাসের কবিতা! তাও একেবারে দাঁড়ি কমা সেমিকোলন শুদ্ধু! কেদার উচ্চহাস্য করে বললেন, কী বদ্রী! খেল দেখিয়ে দিলাম তো!

চন্দ্রনাথ বর্ধন কেদার-বদ্রী জুটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওর চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না উনি কী ভাবছেন। কারণ ওর চোখ সবসময়ই জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলে। বোঝা খুবই অসুবিধের, কী ভাবছেন উনি।

তবে উনি কিছু একটা ভাবছেন। এবং সে ভাবনাটা মোটেই সহজ-সরল নয়।

এম ভি গঙ্গা বাসন্তী থেকে ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আধঘণ্টা বাদে সোনাখালি জেটি থেকে ছাড়ল এম ভি চন্দ্রকেতু। মুখ ঘুরিয়ে এম ভি চন্দ্রকেতু এবার এম ভি গঙ্গার দিকে গতি নিল। নদীর স্রোত অনুকূলেই ছিল। শুরুতেই স্পিড নিয়ে নিল লঞ্চটা। তুলনায় লঞ্চটা একটু ছোট। লঞ্চের হুইলরুমে স্টিয়ারিং ধরে আছে এক দাড়িওয়ালা। লঞ্চটায় কোনও কেবিন নেই। ভেতরে মাঝখানটায় ইঞ্জিন বসানো। দুপাশে বসার জায়গা। ইঞ্জিন চালাচ্ছে গাঁট্টাগোট্টা একটা লোক। গালে আড়াআড়িভাবে লম্বা একটা দাগ। হ্যাঁ। সেই লোকটাও আছে। যাকে দেখা গিয়েছিল চন্দ্রনাথের বাড়িতে, কলেজ স্ট্রিটে, কফি হাউসে। সে হল জগন।

শ্‌শালা! আমাদের হেবি ধোঁকা দিল।

একেবারে ধূর বনে গেলাম মাইরি!

তুই আর বকিস না! কী ফলো করেছিলি? সাইডব্যাগটায় টিকটিকিটা যে ম্যাপটা রাখেনি সেটা দেখিসনি? শ্‌শালা!

মা কসম্ ওস্তাদ! ও ম্যাপটা ভাঁজ করে সাইডব্যাগটাতে-ই রেখেছিল।

বুঝেছি। শালা হেবি চালু। ডেঞ্জারাস লোক। পা ফেলতে হবে হিসেব করে। এদিকে চন্দুখুড়োর খুড়োর কলটাও বেশ পোক্ত।

চন্দুখুড়ো? মানে!

আ রে আমাদের বুড়ো চন্দরনাথ বর্ধন। মাল বুঝতে পারছ না। ও ব্যাটা নাকি রাজপুত্তুর। বলছে ওর নাকি রাজরক্ত। সোঁদরবনে রাজ্য বানাবে। ও হবে রাজা! হো-হো-হো-হো!

তাহলে সোনা-রুপো! গুপ্তধন!

আমরা গুপ্তধন চাই।

হবে হবে। ম্যাপটা তো হাতাতে পারলি না। মাথায় আর একটা বুদ্ধি এসেছে।

কী? কী বুদ্ধি!

ওরা আগে স্পটে যাক। চন্দুবাবুর তো আমাদের দরকার হবেই। পরের কাজ পরে হবে। কী বলিস গঙ্গু?

জী ওস্তাদ।

জগনের হাতে ছিল একটা পাইপগান। পাইপগানটা খুলে ও সেটা দু'ভাগে ভাগ করল। তারপর কেরোসিন তেলে ডুবিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে সেটা পরিষ্কার করতে লাগল।

ছুটতে লাগল এম ভি চন্দ্রকেতু। এখনও সুন্দরবনের অরণ্য আসেনি। দুধারে লোকালয়।

এম ভি গঙ্গাও ছুটে চলেছে সামনের দিকে। ওরা প্রথমে গোসাবায় নামবে। ওপরের ডেকে চেয়ারে বসেছিল বদ্রী, কেদারবাবু ও চন্দ্রনাথ বর্ধন। রাঁধুনি বামুন ওদের এইমাত্র চা আর নিমকি দিয়ে গেল। এবার চন্দ্রনাথবাবু কথা শুরু করলেন, আপনি তো জানেনই যে, সুন্দরবনের এই বনাঞ্চলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সরকার সেইরকম ব্যবস্থা করেছে। এমনকি এ ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কও টাকা দিচ্ছে। এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে শহরের মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। ওদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ওদের আনন্দ-ফুর্তি, ওদের জন্য আরও অক্সিজেন, নির্মল বাতাস,—এর জন্য আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের কোনও সুযোগ না দিয়ে এই জঙ্গলকে ইনট্যাক্ট রেখে দেবার পরিকল্পনা। তাই না?

প্রাচীন ঐতিহ্যকে কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই নতুন জীবনের সৃষ্টি করতে হয়।

কিন্তু যারা এই ঐতিহ্যের দাবিদার, তাদের কি হবে? আমি সেই যুবক বয়স থেকে একটাই লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছি। তা হচ্ছে প্রাচীন গঙ্গারিডির পুনঃ প্রতিষ্ঠা।—এই বলে চন্দ্রনাথ বর্ধন কেমন আবেগাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, সেইসব জনপদ আজ বনভূমি। ভাঁটার সময় এখানকার যত্রতত্র খুঁজে পাওয়া যাবে অনেক ঢিবি। লক্ষ্য করবেন, সেখানে আছে গৃহস্থ বাড়ির গাছপালা। আম-কাঁঠাল, বাঁশঝাড়, বেতঝোপ, বৈঁচি, হেনা, কাঁঠালি-চাঁপা ফুলের গাছ। দেখবেন জরাজীর্ণ বাঁধানো পুকুরঘাট। এইরকম অজস্র ঢিবি আমি খুঁড়েছি। একা একা। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। পেয়েছি আমার পূর্বপুরুষদের কর্মমুখর জীবনের নানা পরিচয়। দেবদেবীর মূর্তি, গৃহস্থালির ব্যবহৃত বাসনকোসন, সীলমোহর, মুদ্রা, এসব ছাড়াও কঙ্কালের ফসিল। রামায়ণের যুগের পর থেকে যে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, সেই সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর এখন বাঘ সাপ হায়নার বসত। এ চলতে পারে না! এসব ধ্বংস হবে! প্রতিষ্ঠিত হবে গঙ্গারিডি সাম্রাজ্য। আমার আজীবন স্বপ্নের সার্থকতা আসবে তবেই। জয় শ্রীগঙ্গা!

বদ্রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল চন্দ্রনাথ বর্ধনকে। চন্দ্রনাথের চোখে স্বপ্ন, দৃঢ়তা ও রূঢ়তা এবং ভয়ঙ্কর বিশ্বাস। অবাস্তব চিন্তাকে ও বাস্তবে রূপ দেবেই। যদি তাতে বাধা আসে, ও যা খুশি তাই করতে পারে। কেদার মজুমদার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমাদের কী করতে হবে?

রাজা চন্দ্রকেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন দেগঙ্গায়। পরবর্তীকালে তাঁর দৌহিত্রের দৌহিত্র চিরঞ্জীবকেতু গভীর বনের ভেতর হলদি নদীর পার্শ্ববর্তী কোনও এলাকায় ফের জনপদ গড়ে তোলেন। গঙ্গারিডিরা তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি।

কেন?

হিউয়েঙ সাঙ তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখেছেন, এখানে সমুদ্র উপকূলে সমতট বা ব্যাঘ্রতটি অঞ্চলে তিরিশটি বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম এবং শতাধিক হিন্দু মন্দির ছিল।

এর থেকে কী প্রমাণ হয়?

প্রমাণ হয় এটাই যে, গঙ্গারিডিদের ওপর বৌদ্ধ ও হিন্দুরা চেপে বসেছিল। ফলে তাদের সাবেক ঐতিহ্য এবং অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। তবুও এরা অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু—

কিন্তু কী?

ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জলদস্যুরা আস্তানা গেড়েছিল সাগরদ্বীপ, কুলপী, তাড়দহ এইসব জায়গায়। পর্তুগীজদের বলা হত ফিরিঙ্গী। ১৬১০ সালে ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তখন অরক্ষিত সাগরদ্বীপ ফিরিঙ্গীদের হাতে চলে যায়। ওরা সাঙ্ঘাতিক অত্যাচার চালিয়ে গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা নদীতে ফিরিঙ্গীদের নৌবাহিনী বা আর্মাডা থাকত। সেই নৌবাহিনী নিয়ে ওরা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার চালাত। অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে এরা নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলকে শ্মশান করে দেয়। ষাট হাজার মানুষকে এরা বাংলার নানা জায়গা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করেছে আরাকান, গোয়া, দিয়াঙ্গা ও চট্টগ্রা
—এইসব কথা বলতে বলতে চন্দ্রনাথ বর্ধনের চোখ দিয়ে আগুন ঝরছি

খানিকটা চুপ করে থেকে চন্দ্রনাথ বর্ধন ফের শুরু করল, চিরঞ্জীবে নয়া প্রতিষ্ঠাও ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর বংশের অনেকেই মারা যান। অনে ধরে পর্তুগীজ ও মগ দস্যুরা দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তবে দু-এব পালিয়ে গিয়ে বংশরক্ষা করে চলেছে আজও। তাঁরা ফের এখানে গড়ে তু

চান জনপদ, রাজত্ব। আমি হলদি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে রাজা চিরঞ্জীবকেতুর কিছু প্রশাসনিক নমুনা খুঁজতে আপনার সাহায্য চাই।

ঠিক আছে। সেই সাহায্য আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন।

বদ্রীনারায়ণ কেদারের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। এই উন্মাদের হয়ে ওই বিপজ্জনক জায়গায় কাজ কবতে হবে! ও কেদারদার দিকে সোজাসুজি তাকাল। কেদারের মুখে-চোখে কোন ভাবান্তর নেই। চোয়াল খানিকটা শক্ত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রনাথ বর্ধন এবার বললো, আপনারা একটু বিশ্রাম করে নিন। আমাদের রাঁধুনি ঠাকুর কিছুক্ষণ পরেই আবার বিকেলের খাবার তৈরি করতে লেগে যাবে।

কেদার মজুমদার বদ্রীকে নিয়ে নিচে নেমে এলেন। কেবিনে ঢুকে বদ্রীকে বললেন, বদ্রী, চিন্তার কোনও কারণ নেই। খুব অঙ্ক কষে কাজে হাত দিলাম। টাইমিং বজায় রাখতে হবে। আমাদের প্রথম কাজ চন্দ্রনাথ বর্ধনের হয়ে কাজ করা। আর এই মুহূর্তের কাজ বাথরুমে ঢুকে আরামসে চান করা। দ্বিতীয় কাজ হল একটা লম্বা ঘুম। ব্যাস্! জিন্দেগিকে সফরমে গুজর যাতে :হ্যায় যো মওকা/উও ফির নেহি আয়েগা। লা লা। লালালা! লা লা, লালালা!

চার

গোসাবা জেটিতে লঞ্চ থামার পর কেদার মজুমদার বদ্রীকে লঞ্চে রেখে একটু ঘুরে এলেন। যাওয়ার সময় বদ্রীকে বলে গেলেন, বদ্রী, চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে একটু গল্পগুজব কর। ওনার গবেষণা সম্পর্কে একটু জেনে নে। সুন্দরবনে এই নিয়ে দুবার এলি। সুন্দরবনের হাল-হকিকৎ একটু জানার চেষ্টা কর।

এখন বিকেল পাঁচটা। গ্রীষ্মকাল। এখনও দিনের আলো অনেক। তাই এই খোলামেলা জায়গায় পড়ন্ত বেলা ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। গোসাবা জেটির সামনে গোসাবা থানার একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও একটা প্রাইভেট লঞ্চ জেটি থেকে একটু দূরে নোঙর করে আছে। বদ্রী কিছুক্ষণ চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু ঠিক ভালো লাগল না। আসলে বদ্রীনারায়ণ যতটা না কথা বলছিল, তার চেয়ে বেশি চন্দ্রনাথের মনটা পড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। কাজেই তাল কেটে যাচ্ছিল গল্পে। এদিকে চন্দ্রনাথবাবুও বদ্রীকে ততটা পাত্তা দিচ্ছিলেন না। ভাবছিলেন, তাঁর এই কাজে এই ছেলেটা একেবারেই গুরুত্বহীন।

আধঘণ্টা হয়ে গেছে। কেদারদা এখনও এল না। বদ্রী ভাবছিল, গোসাবায় এমন কী কাজ থাকতে পারে কেদারদার! বদ্রী এবার নিচে নামল। নিচে মেশিনঘরের পাশে রাঁধুনি বামুন বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। মেশিনম্যান চুপচাপ বসে আছে। বদ্রী মেশিনম্যানকে জিজ্ঞেস করলো, এই লঞ্চটা কি প্রাইভেট ?

এটা চন্দ্রনাথবাবুর নিজের লঞ্চ।

বাঃ। চন্দ্রনাথবাবু তো বেশ বড়লোক! দেখলে বোঝা যায় না। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগে দেখতে।

তা ঠিক। গঙ্গাপুজো করেন। দেবদ্বিজে ভক্তি আছে। পয়সাও আছে। আরও একটা লঞ্চ আছে ওনার। ওটার নাম এম ভি চন্দ্রকেতু।

তাই নাকি ?

বদ্রী ওখান থেকে চলে এসে নিজের কেবিনে ঢুকল। লিও উঁরিসের এক্সোডাস বইটা ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিল ও। সেটা বের করে পড়তে শুরু করল। আর মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ বইটা পড়ে ও বইটা রেখে দিল। ভালো লাগছে না। কেদারদা এখনও আসছে না। আশ্চর্য! কোনও বিপদ হল না তো! বদ্রী একটু চিন্তান্বিত হল। ফের ও কেবিন বন্ধ করে ওপরে ডেকে গেল। উঠে দেখল, চন্দ্রনাথবাবু একটা

দূরবীন দিয়ে কী যেন দেখছেন। বদ্রীর একটু সন্দেহ হল। ও চুপচাপ উল্টো দিকে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। নদী, স্থলভাগ আর অপরাহ্নের আকাশজুড়ে চলছে প্রকৃতির লীলাখেলা। পশ্চিম দিগন্তে সন্ধ্যাকালে যেন রক্তিম রঙমশালের ললিত আভা। বদ্রীর চোখ বুজে এল এমনিতেই। মাথাটাও নুয়ে এল। একটা ভটভটি বেশ জোরেই ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। ছড়িয়ে দিয়ে গেল ডিজেল পোড়ানো একরাশ কালো ধোঁয়া।

কী হে বদ্রীনারায়ণ! কী ভাবছ? —চন্দ্রনাথবাবুর আচমকা ডাকে বদ্রী একটু চমকে গিয়েছিল। চন্দ্রনাথের চোখে চোখ পড়তে বদ্রী শিউরে উঠল। ওর লাল আর নীলে মেশানো কোটরাগত চোখদুটো ভাঁটার মতো জ্বলছে। বদ্রী মুহূর্তের জন্য হলেও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর বড্ড একা লাগছিল। তার সঙ্গে খানিকটা আশ্রয়হীনতাও। তখনই জেটির মাথা থেকে কেদারদার গলা, বদ্রী! বদ্রী। কী করছিস! কাঠটা ধর তো ভালো করে। আমি উঠে নিই।

কেদারদার গলা পেয়ে বদ্রীর শূন্যতাবোধ শূন্যে মিলিয়ে গেল। এম ভি গঙ্গা যখন চলতে শুরু করল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে চরাচরে।

এম ভি গঙ্গা ভেসে চলেছে হোগল নদীর ওপর দিয়ে। বেশ জোরেই যাচ্ছে। সজনেখালিমুখী ওদের যাত্রাপথ। প্রথম বাঁক পেরিয়ে লঞ্চ দুর্গাদোয়ানি নদীতে পড়ল। জ্যোৎস্নাভরা আকাশ। দু'পাশে জনপদ শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধুই বন। সন্ধ্যার মায়াবী জ্যোৎস্নায় সেই অরণ্যভূমিকে মনে হচ্ছিল নিকষ অন্ধকারের স্তূপের মতো। চন্দ্রনাথ বর্ধন আর কেদার ওপরে দুটো চেয়ার নিয়ে বসেছিল। চন্দ্রনাথের চোখে ছিল স্বপ্ন। ও ভাবছিল—এই নীরব অরণ্যের বুকে আমি গড়ে তুলব মানুষের বসতি। তৈরি করব গঙ্গামন্দির। আধুনিকতার নামে এইসব বেলেল্লাপনা ভেঙে দেব। তৈরি হবে গঙ্গারিডি রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বাস করতে গেলে গঙ্গাজাতির ওপর কেউ মাথা তুলে কথা বলবে না। আমার জাতিকে আমি শেখাব, তোমরাই সেরা। আর সবাই তুচ্ছ। যদি কেউ মাথা তুলে কথা বলতে চায়, তবে তার মাথা গুঁড়িয়ে দাও। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দাও। ওদের উপাসনালয় ভেঙে ধূলিসাৎ করে দাও। জয় শ্রীগঙ্গা!

এর পাশে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেদার মজুমদার আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যাতারাকে খুঁজে নিচ্ছিল। আর বুঝতে চেষ্টা করছিল চন্দ্রনাথ

বর্ধনকে। নিচে কেবিনে শুয়েছিল বদ্রী। চারদিকের নিস্তব্ধতায় ও আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শব্দ যেন পৃথিবীর বুক থেকে উধাও হয়ে গেছে। সময় যেন থেমে গেছে এখন। পারিপার্শ্বিক সমস্ত শব্দ যখন ওর কানে আসছিল না, ওর দ্বিতীয় সত্তা ওর অবচেতন মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে তখন। অ-নে-ক—অ-নে-ক— অনেকক্ষণ বাদে ওর মনে হল, আর একটা লঞ্চ যেন সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পেছন পেছন আসছে। এটা কি ভ্রম ? ও আবার কান রাখল বাতাসে। সেই একই শব্দ। শব্দটা সমানতালে ওদেরই সঙ্গে সঙ্গে আসছে। বদ্রী গন্ধ পাচ্ছিল নোনা জল আর পাড়ের সোঁদা মাটির। সেই নিবিড় গন্ধের পাশাপাশি ক্রমাগত ওই শব্দটাও ওর কানে এসে আঘাত করছিল। বদ্রী সতর্ক হয়ে উঠল। কোনও বিপদ! যে বিপদ তার সমস্ত ডালপালা মেলে দিয়ে ওদের আঘাত করতে নিঃশব্দে ওদের পিছু নিয়েছে! বদ্রী বিছানা থেকে উঠে পড়ল। ব্যাপারটা কনফার্মড হওয়া দরকার। ও কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে সোজা ওপরে উঠে গেল। আপনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনি একটা ভাব করলেও বদ্রী নদীর দু'পার এবং সামনে-পেছনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল।

একটা নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে নদী কেটে তরতর করে এগোচ্ছিল এম ভি চন্দ্রকেতু। চন্দ্রকেতুর সব আলোই বলতে গেলে নেভানো। এমনকি হুইলরুমে সারেঙের কেবিনের মাথায় সতর্কতাসূচক রেড ল্যাম্পটাও জ্বলছে না। নিচেও ব্যাটারিচালিত কোন আলো জ্বলছে না। ইঞ্জিনের সামনে একটা হ্যারিকেন টিম টিম করে জ্বলছে। লঞ্চ চালাচ্ছে সেই দাড়িওয়ালা লোকটাই। একশ হাত দূরে থাকলেও এম ভি চন্দ্রকেতুর উপস্থিতি বোঝা ভার। কারণ আকাশে বেশ বড় একখণ্ড কালো মেঘ চাঁদকে আড়াল করেছে। কিন্তু এম ভি চন্দ্রকেতুর মোটরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছেই। লঞ্চের ভেতরে ইঞ্জিনম্যান ছাড়াও চারজন বসে আছে। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয় ওদের মুখগুলো বীভৎস দেখাচ্ছিল। চারজনই মদ খাচ্ছে। গালে কাটা দাগওয়ালা বীভৎস মুখের লোকটা মদের গ্লাসটা উপুড় করে ঢেলে জড়ানো গলায় বলল, শ্‌শালা! এই অন্ধকারের মধ্যে ভাললাগে!

কেন ? খারাপ লাগার কি আছে? মদ-মাংস তো গিলেই যাচ্ছ!

না গুরু ? মেশিন-ফেশিনগুলো সব জং ধরে যাচ্ছে। খেল্‌টা শুরু হচ্ছে কবে ?

চন্দুখুড়ো বলেই দিয়েছে, কাল দুপুর থেকেই আমাদের খেল্।

সোনা-চাঁদি মিলে যাবে?

জরুর! কি বে! তুই সেদিন কফি হাউসে কী শুনেছিস? বল্!

লোকটা টিকটিকিটাকে বলছিল, সোনা না পাওনা গেলেও সোনার চেয়ে দামি জিনিস পাওয়া যাবে।

তাহলে মাটির নিচে কলসি কলসি হীরে-মুক্তো আছে?

জরুর আছে! না হলে চন্দুখুড়ো হাজার হাজার টাকা খরচা করছে কেন?

হ্যাঁ। কিন্তু ম্যাপটা তো টিকটিকিটার কাছে।

আ রে সেই জন্যই তো!

কী?

ম্যাপ।

মানে?

মানে ম্যাপ।

তাতে কী?

আ রে সেই জন্যই তো অ্যাতো কিছু। বুঝতে পারছ না চাঁদ।

না সমঝমে আসছে না।

আরও আছে। ওই যে টিকটিকিটার সঙ্গে বাচ্চা চিঁড়িয়াটা আছে না! উও ভি আর এক চীজ।

হ্যাঁ!

দেখবি, দেখবি। কাল কেমন খেল্ জমবে। লে লে! গেলাসে মাল ঢাল।

ওদের মধ্যে জগন অনেক সিরিয়াস। ওর জটিল মুখখানা হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোতে নিষ্ঠুর লাগছিল। ও এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, অ্যাই! একদম হাল্লা করবি না! চুপচাপ মাল খাচ্ছিস, মাল খা।

আর যে দাড়িওয়ালা লোকটা এম ভি চন্দ্রকেতুর স্টিয়ারিং হুইল ধরেছিল, তার মুখে ছিল শিশুর মতো সারল্য আর নির্লিপ্তি।

এম ভি গঙ্গার ওপরে দাঁড়িয়ে বদ্রীনারায়ণ খুব ভালো করে লক্ষ্য করছিল চতুর্দিক। এতক্ষণ জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো নদী-জলের ওপর মায়ার বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু কোথা থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে চাঁদটাকে আড়াল করে দিল। এখন রহস্যময় আঁধার। দূরে তাকালে মনে হয়, অশরীরী ছায়ারা

সব ঘুরে বেড়াচ্ছে জলের ওপর। আমার মনে হচ্ছে কিছু নেই। কিন্তু বদ্রীর অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ। একটা লঞ্চের মোটরের আওয়াজ ওর কানে আসছিল ক্রমাগত। ও এবার ওর সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে জড়ো করল নিজের দৃষ্টিতে। তারপর এম ভি গঙ্গার ফেলে আসা জলপথের রেখা ধরে তাকাল নিবিড়ভাবে। বহু দূরে মনে হল একটা লঞ্চের অবয়ব। কোন আলো নেই। একবার যেন একা ক্ষীণ আলো দেখা গেল। আবার সেটা হারিয়েও গেল। এবার বদ্রী ডাকল, কেদারদা। ও কেদারদা!

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর এম ভি গঙ্গার সবাই ঘুমের জন্য তৈরি হতে লাগল। লঞ্চ সজনেখালি ছাড়িয়ে আরও মাইলখানেক দূরে নোঙর করা হল। এখানকার নদীর নাম গাজিখালি। রাঁধুনি বামুন, দুজন খালাসি আর সারেঙ—ওরা সবাই শুয়ে পড়ল। চন্দ্রনাথ বর্ধন অনেকক্ষণ ডেকে বসে রইল। শেষ পর্যন্ত কেদার বললেন, আরে, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। কাল চূড়ান্ত পরিশ্রম হবে।

চন্দ্রনাথবাবু সামান্য হেসে বললেন, রাতে আমার ঘুম আসে না। ঘুম এলে নিচে গিয়ে শুয়ে পড়ব। আপনারা শুয়ে পড়ুন গে। রাত আমার বড় প্রিয়। আর এই নদীর বুকে আমার স্বপ্ন কল্পনা দিশা হারিয়ে ছোটে। এতেই আমার সুখ। —এই বলে চন্দ্রনাথবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। দেখে বদ্রীর কেন জানি খুব মায়া হল, লোকটা বোধহয় তত খারাপ নয়।

তাহলে আমরা শুয়েই পড়ি। —বলে কেদার বদ্রীকে নিয়ে নিচে কেবিনে চলে এলেন। বদ্রীকে কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়াতে বলে কেদার নিজের হোল্ডঅলটা খুললেন। সেখান থেকে বের হল সেই কোল্ট রিভলভারটা। বদ্রীকে বললেন, কী রে! তোর সেই যন্ত্রটা সঙ্গে আছে তো?

বদ্রী বলল, হ্যাঁ কেদারদা। ভুলিনি।

কেদার বললেন, নে। এবার দরজাটা বন্ধ করে দে। তোর সাথে অনেক কথা আছে।

বদ্রী বলল, হ্যাঁ, কেদারদা, তোমাকেও কতকগুলো ইনফরমেশন দেওয়ার আছে।

সেই রাত্রে কেদার-বদ্রী জুটি পাক্কা তিন ঘণ্টা নানা বিষয়ে ডিসকাস করল এবং আগাম পরিকল্পনা ছকে নিল। শুয়ে পড়ার আগে কেদার বললেন, বদ্রী, তাহলে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কার হয়ে কাজ করব?

বদ্রী বলল, অব কোর্স চন্দ্রনাথ বর্ধনের হয়েই আমরা কাজ করব।

পাঁচ

পঞ্চমুখানি, দেউলভারানি, নোয়াবেঁকি নদী পেরিয়ে এম ভি গঙ্গা ছুটে চলেছে গন্তব্যের দিকে। আজ খুব ভোর-ভোর উঠেই সারেঙ লঞ্চ স্টার্ট করে দিয়েছে। বদ্রীর ঘুম ভেঙেছে লঞ্চ স্টার্টের অনেক পরে। সকাল সাতটায়, ঘুমচোখ নিয়েই ও উঠে এসেছিল ওপরে। চায়ের কাপে মুখ দিয়ে ও দেখছিল বৈচিত্র্যময় অরণ্য সুন্দরবনকে। সুন্দরী, পাকুড়, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, কাঁকড়া, গেঁয়ো, গর্জন, হেঁতাল, বলা, বনঝাউ, গাব, ওড়া, খলসি, করঞ্জ, হিঙ্গে, গড়িয়া, সিঙ্গুর, ভাঁড়ার, হরগোছা, ওড়াধন, কাশা, তুলাটেপারি গাছ ছাড়াও বেত ও লতার বনও বদ্রী চিনে নিল চন্দ্রনাথবাবুর কাছ থেকে। বদ্রী এর আগেরবার যেসব গাছপালা বা পাখির নাম শুনেছিল, এবার চন্দ্রনাথবাবু তার থেকে আরও বেশি নাম জানালেন। এম ভি গঙ্গা প্রচণ্ড গতিতে ছুটছিল। কেদার দূরবীনে চোখ রেখে এদিক সেদিক দেখছিলেন। চন্দ্রনাথবাবু আজকে বদ্রীর সঙ্গে জমে গেছেন। বলছিলেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর কুমিরের হিংস্রতার কথা তোমরা খুব শোন, কিন্তু এখানকার বুনো শুয়োরও কম হিংস্র নয়। এ ছাড়াও এই বনে আছে চিতা হরিণ, কুকুর, সজারু, বনবিড়াল। সুন্দরবনের অজগরও বিশাল হয়। এখানে গণ্ডারও পাওয়া যেত আগে। সাপের মধ্যে কেউটে, গোখরো, পাতরাজ, ধনীরাজ, শঙ্খচূড়, মণিরাজ, ভীমরাজ, শাঁখামুটি, কানড়, নাগরচাঁদ, মণিচুর এসব আছে।

আচ্ছা, এই বিশাল বনে কি বেশি পাখি নেই?

কে বললো নেই? কয়েকটা পাখি এখন না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে অনেক পাখিই আছে। এর মধ্যে কাক, বক, চিল, কুল্যা, মাছাল, বালিহাঁস, গয়াল, মানিক, শামখোল, মদনটাক, চাতক, মাছরাঙা, ঘুঘু, কুকড়ো, বাটাং, হটটিটি, ফিঙে, হলদে পাখি, দোয়েল, বনমোরগ, চিড়ে বাটাং, দুধরাজ, ভীমরাজ, বৈকুণ্ঠ—এসব পাখি তো আছেই। আর একটা কথা জেনে রাখো। সুন্দরবনের খলসি ও সিঙ্গুর গাছের ফুল থেকে সুস্বাদু মধু পাওয়া যায়। এই বন থেকে মধুসংগ্রহকারীরা বছরে প্রায় ছ'হাজার মণ মধু সংগ্রহ করে।

এদিকে এগিয়ে চলেছে এম ভি গঙ্গা। লঞ্চ সুন্দরবনের কোর এরিয়ায় ঢুকে পড়েছে। বড় নদী থেকে ছোট খাঁড়ি, ছোট নদী, আবার হয়তো লঞ্চ বড় নদীতে পড়ছে। এক একটা বাঁক কিংবা মোড় ঘুরলেই সবুজ কিন্তু ভয়াল এই সৌন্দর্যমেখলা উন্মোচিত হচ্ছিল বদ্রীর সামনে। খানিক পরেই ওরা নেতাই

নদীতে এসে পড়ল। . সামনেই নেতিধোপানির ঘাট। এখানে জেটি, ওয়াচ-টাওয়ার সবই আছে। মানুষজন থাকায় এইখানে প্রাণচঞ্চলতাও আছে। লঞ্চ এখানে থামল না। এগিয়ে চলল সামনে। আবার নৈঃশব্দ্য। লঞ্চ চলছে দ্রুতগতিতে। এর পর এম ভি গঙ্গা হলদিবাড়ি ফরেস্টের বীট অফিসে এল। সুন্দরবনের কোর এরিয়ার একেবারে মধ্যিখানে এই অফিস। কোনও জেলে নৌকো বা লঞ্চের এখানে ঢোকার নিয়ম নেই। বনদপ্তর, পুলিস বা সরকারি লঞ্চগুলোই এখানে আসে। বীট অফিসে গিয়ে এম ভি গঙ্গার কোর এরিয়ায় ঢোকার পারমিশনের কাগজপত্র দেখানো হল। চন্দ্রনাথ বর্ধন এইসব ক্ষেত্রে নিখুঁত কাজ করেছেন বোঝা গেল।

এবার হলদি নদীর ওপর দিয়ে চলতে লাগল এম ভি গঙ্গা। জনমানবহীন কোর এরিয়ায় পাথরচাপ নিস্তব্ধতা। মাঝে মাঝে বনের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদের ডাক শোনা যাচ্ছিল। চন্দ্রনাথ বর্ধন বললেন, আমরা গন্তব্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কেদারবাবু, আপনারা রেডি হয়ে নিন।

চন্দ্রনাথবাবু একটা ম্যাপ খুলে বসেছেন। ম্যাপটাকে কাঠের মেঝেতে পেতে উনি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। উনি বলছিলেন, ফরেস্ট অফিস ছাড়িয়ে এক কিলোমিটার সামনে, এই হচ্ছে বাঁদিকে প্রথম খাঁড়ি। কেদারবাবু, এবার আপনি মাইনটলি খাঁড়িগুলোর হিসেব রাখবেন। আচ্ছা বদ্রীনারায়ণ, ভাঙা বাড়ি কিংবা ইটের স্তূপ দেখতে পেলে আমাকে বলবে।

চন্দ্রনাথবাবু ফের ম্যাপে মন দিলেন। কেদার বললেন, আমরা বাঁদিকের প্রথম খাঁড়ি পেরোলাম।

আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার ডানদিকে একটা বেশ বড় খাঁড়ি পড়বে। কেদারবাবু, খেয়াল রাখবেন। খাঁড়িটা গোড়ার দিকে ইংরেজি 'এস'-এর মতো বেঁকে গেছে কিনা! সারেঙ! আর একটু স্পীড তোলো হে!

বদ্রী এবার চেঁচিয়ে উঠল, এই তো একটা ইটের স্তূপ দেখা যাচ্ছে! চন্দ্রনাথবাবু তো ঠিকই বলেছেন!

হ্যাঁ। চন্দ্রনাথ বর্ধনের ভুল হবার কথা নয়। যদি আমার কথা না মেলে, সেটাই হবে অস্বাভাবিক।

লঞ্চ চলছে বেশ জোরে। দূরে ডানদিকে একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। বদ্রী বলল, ওই তো ডানদিকে একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে।

চন্দ্রনাথবাবু জোরে চেঁচিয়ে বললেন, সারেঙ, স্পিড কমাও! ওটার মুখটা অবশ্যই ইংরেজি 'এস'-এর মতো হবে! কি, দেখা যাচ্ছে!

কেদার মজুমদার ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলেন খাঁড়িটার মুখটা ইংরেজি 'এস'-এর মতো। তবে কী একটা ব্যাপার কেদার মজুমদারের মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করল। কোন একটা বিষয়ে খটকা লেগেছে তাঁর। কপালটা কোঁচকালেন কেদারদা। বদ্রী সেটা লক্ষ্য করল। চন্দ্রনাথ বর্ধন বললেন, সারেঙ, লঞ্চ খাঁড়িতে ঢোকাও! আড়াইশ হাতখানেক গিয়ে লঞ্চ দাঁড় করিয়ে দাও।

সারেঙ ইঞ্জিন বন্ধ করার ঘণ্টি বাজাল। ইঞ্জিন বন্ধ হলেও প্রবহমান গতিতে লঞ্চটা খাঁড়ির মধ্যে আড়াইশ-তিনশ হাত চলে গেলো। এম ভি গঙ্গার ডিজেলচালিত ইঞ্জিনটা থেমে যাওয়ামাত্রই নিস্তব্ধতা যেন সকলকে গ্রাস করল। একমাত্র বদ্রী উৎকর্ণ হল। ওর মনে হল, সামনের দিকে, অর্থাৎ খাঁড়ির ভেতরে আরও এগিয়ে একটা লঞ্চের শব্দ। বদ্রী আরও মনোযোগ দিল। না, এবার সেই আওয়াজটাও থেমে গেল। বদ্রী একফাঁকে ব্যাপারটা কেদারকে জানিয়ে দিল।

এই জায়গাটা সুন্দরবনের কোর এরিয়ার কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। এখানে পশুপাখি শিকার করা নিষেধ। অনুমতি ছাড়া মানুষের ঢোকাও নিষেধ। নিবিড় ভয়াল বনাঞ্চল। নিস্তব্ধ। বদ্রীর গা ছমছম করছিল এক অজানা আশঙ্কায়। পশুদের জন্য সুরক্ষিত, কিন্তু মানুষের জন্য অরক্ষিত এই বনে ওরা নামল। অজানা এক আশঙ্কা বদ্রীর অনুভূতিতে বারে বারে বিপদসঙ্কেত দিচ্ছিল। তবে অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনাও ছিল প্রবল। বিরাট এক হেঁতাল ঝোপের পাশ দিয়ে ওরা আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকছিল। হেঁতাল ঝোপে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকে, কেদারদার এই কথা শুনে বদ্রী একটু সঙ্কুচিত হলেও ওর মন বলছিল, বিপদ এদের থেকে আসবে না। বিপদ আসবে মানুষের কাছ থেকেই। কেদার মজুমদার নিজের ম্যাপটাও বের করেছেন। চন্দ্রনাথ বর্ধনের ম্যাপের ডিরেকশনের সাথে এই ম্যাপের ডিরেকশনের খুব একটা তফাৎ নেই। রাজা চিরঞ্জীবকেতুর নয়া বসত গড়ে উঠেছিল এখানেই বলে মনে করা হচ্ছে। হেঁতালের ঝোঁপটা শেষ হতেই একগুচ্ছ সুন্দরী গাছের বন। এপাশে-ওপাশে অজস্র কাঁটাঝোপ টপকে টপকে চন্দ্রনাথবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ওদের একটু বেশি সময় লাগছিল। এখন বোঝা গেল, চন্দ্রনাথবাবুর শরীর তেমন একটা জুতসই নয়। তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে এই অজানা-অচেনা জঙ্গলে চলা বেশ মুশকিল। এবার বদ্রীর মনে হল, শুধু মাটি নয়, চলতে চলতে ইটের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল। সুন্দরী গাছের বনটা শেষ হওয়ামাত্রই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। দুপুরের রোদ্দুরে জায়গাটা ঝকমক করছে।

ছড়ানো-ছেটানো দু-একটা কাঁঠালগাছ, তুলসী আর আনারসের ঝোপ রয়েছে কয়েকটা। এবার ওরা বিস্মিত! তুলসী ঝোপের পাশে একটা বড় অশ্বত্থ গাছকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ভাঙা মন্দিরের অবশিষ্টাংশ। চন্দ্রনাথবাবু খেয়াল করেননি। বদ্রী দেখেই চেঁচিয়ে উঠল। শুনে চন্দ্রনাথবাবু ধীর স্থির শান্ত হয়ে রইলেন। তারপর কেদার মজুমদারকে বললেন, কেদারবাবু, আমাদের লঞ্চকে একবার সিগন্যাল দিয়ে দিন। এই বলে উনি তাঁর ঝোলা থেকে একটা বাঁশি বের করে কেদার মজুমদারের হাতে দিলেন। কেদার মজুমদার বাঁশিতে জোরে ফুঁ দিলেন। বনাঞ্চলের নিস্তব্ধতা ধাক্কা খেল। প্রত্যুত্তরে এম ভি গঙ্গার ভোঁ বেজে উঠল। একবার—দু'বার—তিনবার।

ওরা তিনজনই শুধুমাত্র বনের মধ্যে নেমেছে। লঞ্চের আর কেউই প্রাণ বিপন্ন করতে রাজি নয়। রাঁধুনি বামুন লঞ্চে দুপুরের রান্না বসিয়ে দিয়েছে।

আর একটা ঘটনা ঘটে চলেছিল চুপিসাড়ে। এম ভি চন্দ্রকেতু লঞ্চটা জগনের নেতৃত্বে এম ভি গঙ্গার পিছু পিছু আসছিল। শুধুমাত্র শেষ মুহূর্তে হলদিবাড়ি ফরেস্টের বীট অফিস এড়াতে তার আগেই ওরা ডানদিকের একটা খাঁড়িতে ঢুকে যায়। সেই খাঁড়ি পেরোলেই একটা নদী। এবার এম ভি চন্দ্রকেতু ফের বাঁদিকে ঘুরে নদীর বাঁদিক দিয়েই চলতে শুরু করল। চন্দ্রকেতু স্পিডও বাড়াল। বাঁদিকের একটা সরু খাঁড়ি ছাড়িয়ে আরও সামনে চলল। এর পর বাঁদিকে একটা বড় খাঁড়ি। জগন এবং তার তিন সাকরেদ দাঁড়িয়েছিল ওপরে। জগনের হাতে একটা রিভলভার। জগন সেই দাড়িওয়ালা সারেঙকে নির্দেশ করে যাচ্ছিল। সবার চোখেমুখে উত্তেজনা থাকলেও কোনও উত্তেজনা ছিল না সারেঙের মধ্যে। জগন এবার জোরে বলল, সারেঙ, বাঁয়ের খাঁড়িতে লঞ্চ ঢোকাও।

লঞ্চের স্পিড কমে গেল। লঞ্চ ঢুকল বাঁদিকের খাঁড়িতে। বেশ খানিকটা গিয়ে এম ভি চন্দ্রকেতু দাঁড়িয়ে পড়ল খাঁড়ির মধ্যিখানে। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে যেতেই এক ঘনায়মান নীরবতা নেমে এল। চারদিকে কোনও মানুষ নেই। শুধু বন আর বন। জগন ছাড়া ওর সাকরেদগুলোর কেউই প্রকৃতিস্থ ছিল না। এই জন্যই হয়ত এই ভয়াল অরণ্যের বিপদ সম্পর্কে ওরা কিছু বুঝতে পারছিল না। এই অরণ্যও বুঝি অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের মেনে নিতে পারছে না। চরাচরে তাই কেমন একটা থমথমে ভাব। নদীতে, খাঁড়িতে অনবরত বয়ে যাওয়া জলের কলকল শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। শুধু মাতালগুলো লঞ্চের ওপর উৎকট শব্দে কথা বলছিল। অশ্রাব্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে গালাগাল করছিল।

ছয়

এদিকে কেদার মজুমদার ম্যাপের ডিরেকশন অনুযায়ী ভাঙা মন্দিরের ডান দিক বরাবর আরও হাত পঞ্চাশেক এগিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে গাঁইতি। চন্দ্রনাথবাবু পরিকল্পনামাফিক সবই নিয়ে এসেছেন। বদ্রীর হাতে হাঁসুয়ার মতো একটা ধারালো লম্বা দা। তাই দিয়ে ও ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। এখন ওকে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছে। ওদের পায়ের আওয়াজে দু-তিনটে বনমোরগ এদিক ওদিক ছুটে পালাল। চন্দ্রনাথবাবু ওদের পেছন পেছনেই আসছিলেন। তবে ওকে বেশ ক্লান্ত লাগছিল। কেদার মজুমদার বললেন, এবার একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঘাড়ে এসে পড়লেই হল।

চন্দ্রনাথবাবু কথাটা শুনে বললেন, অন্তত এখন ধারে কাছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই। আধমাইলের মধ্যে কোনও রয়্যাল বেঙ্গল চলে এলে আমার ঘ্রাণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

ভাঙা মন্দির ছাড়িয়ে ওরা তিনজন আরও দু'শ হাত জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে। এখানে কোন বড় গাছ না থাকলেও হাঁটু সমান ঝোপঝাড় রয়েছে। বদ্রীনারায়ণ উৎসাহের সঙ্গে হাঁসুয়াটা দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে এগোচ্ছিল। কেদার মজুমদার বারেবারেই সাবধান করে দিচ্ছিলেন, বদ্রী, সাপখোপ সম্পর্কে সাবধান!

চন্দ্রনাথ বর্ধন এই কথা শুনেও হাসলেন। বললেন, ভয় নেই। বদ্রীর অনুভূতি খুব প্রখর। বিপদ এলে আগেই টের পাবে।

কেদার বললেন, আপনি কি করে বুঝলেন?

চন্দ্রনাথবাবুর উত্তর, গত পরশু ওকে আমি খুব কাছ থেকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি। আর গতকাল ওর সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি। এ রকম ছেলে দু-একটাই পাওয়া যায়। আর একটা কথা, যে কথাটা আজকে বলতে কোন বাধা নেই। বেলগাছিয়া ভিলায় আমার বাড়িতে প্রথম দেখেই আমি ওকে বুঝে নিয়েছিলাম, ও এক্সট্রা-অর্ডিনারি ছেলে। তাই আপনার সঙ্গে ওকে আমার ব্যাপারে নিতে আমি কোন আপত্তি জানাইনি। বদ্রী তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। এই আলোচনা ওর কানে যাচ্ছিল না। চন্দ্রনাথবাবু এক রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, বস্তুত আপনারা দুজনই আমার কাজের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। আপনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এবার কেদার চুপ করে থেকে কপাল কুঁচকে চন্দ্রনাথবাবুর কথার মোচড়টা বোঝার চেষ্টা করলেন।

দূরে একটা বড়সড় ঘন ঝোপ দেখা যাচ্ছিল। এলাকাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনও গৃহস্থবাড়ির উঠোন। গৃহস্থ বাড়ি নেই, তাই বুঝি বাড়িটা জঙ্গল হয়ে গেছে। কয়েকটা কলাগাছের ঝাড়, দু-তিনটে জামগাছ, দুটো বেশ বড় কাঁঠালগাছও রয়েছে। ছড়ানো-ছেটানো ইঁটকাঠের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছিল এলাকাটা জুড়ে। তিনজনের পায়েই ছিল রবারের তৈরি হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা প্রোটেকটিভ জুতো। এসব চন্দ্রনাথবাবুর সংগ্রহ। বদ্রী হাতে অস্ত্রটা পেয়ে খুব সাহসী হয়ে উঠেছে। ও রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে বেশ দ্রুত এগোচ্ছিল। ঘন বিরাট ঝোপটায় হাঁসুয়ার কোপ পড়তেই খটাং করে শব্দ হল। বদ্রী চমকাল। আরও শিউরে উঠল বদ্রী। বিরাট একটা সাপ লতাগুল্মের মধ্যে চুপচাপ পড়েছিল। হাঁসুয়াটা কোন শক্ত জিনিসে আঘাত করতেই আওয়াজ উঠল খটাং করে। এদিকে শুকনো পাতার ওপর তিনজনের পায়ের শব্দে সাপটা মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে লতাগুল্মের ভেতর থেকে নিজের শরীরটা বাইরে বের করে এনে সড়সড় শব্দ করতে করতে চলতে শুরু করল। কী ভয়ানক! বিরাট সাপ। বেশ মোটা। সাপটার গায়ের সবুজ-লাল-কালো রঙের বীভৎস সংমিশ্রণ দেখে বদ্রীর গা·শিরশির করে উঠল। গা পাক দিয়ে বমির উদ্রেক হল। চন্দ্রনাথবাবু দূর থেকেই অনুভবে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললেন, ওকে চলে যেতে দাও। মনে হচ্ছে অজগর। ক্ষেপে গেলে আমাদের গিলে খাবে।

ওরা তিনজনই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বদ্রী খানিকক্ষণ থেমে আবার কাজ শুরু করল। যে জায়গাটায় খটাং করে শব্দ হয়েছিল, বদ্রী সে জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করল। কিছু লতাপাতা পরিষ্কার করার পর পুরনো ইটের একটা কাঠামোর চেহারা মনে হল। কেদারবাবুও তখন জঙ্গল পরিষ্কার করতে হাত লাগিয়েছেন। চন্দ্রনাথবাবু ম্যাপটা মেলাচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখতে ওর অসুবিধা হচ্ছিল মনে হয়। শেষ পর্যন্ত সাহায্য নিতেই হল। বললেন, কেদারবাবু, ম্যাপের স্টার মার্ক জায়গাটা দেখুন তো! আগের ফেলে আসা ভাঙা মন্দিরটা থেকে কোন দিকে?

কেদার চন্দ্রনাথবাবুর দুহাতে মেলে ধরা ম্যাপটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন। বললেন, ভাঙা মন্দির থেকে সোজা পূব দিকের ডিরেকশনে খানিকটা গিয়ে স্টার মার্ক করা আছে। তখন বদ্রী জঙ্গলটা পরিষ্কার করতে করতে বলল, এটা একটা ভাঙা বাড়ি মনে হচ্ছে। এই ঘন ঝোপটা বাড়ির দেওয়ালের চারদিকেই উঠেছে মনে হচ্ছে।

বদ্রীর কথা শুনে চন্দ্রনাথবাবু·মনে মনে বললেন, কোন ভুল হয়নি আমার। এই-ই আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি।

কেদার মজুমদার ভাবছিলেন, ব্রতীনবাবুর ম্যাপ অনুযায়ী হলদি নদীর কাছাকাছি স্থলভাগে এইসব এলাকার কোথাও মহারাজ চন্দ্রকেতুর কোষাগার ছিল। সুতরাং রাজবাড়ি, মহল, মন্দির, পুকুরের বাঁধানো ঘাট এসব থাকবেই।

চন্দ্রনাথবাবু ভাবছিলেন, রাজা চিরঞ্জীবকেতুর নয়া বসত গড়ে উঠেছিল এখানেই। এখানেই শীলমোহর, রাজার ছাপমারা রুপোর মুদ্রা থাকার কথা। চিরঞ্জীবকেতুর সম্পদের এক দশমাংশ উদ্ধার করতে পারলেই মাইকেলসন সাহেবের সাহায্য নিয়ে গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের প্রচার চালানো যাবে বিশ্বজোড়া। কেদার মজুমদার ভাবছিলেন, মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেলে হইচই পড়ে যাবে।

দেখা গেল, ঠিকই আছে। এটা একটা বিশাল অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ। জীর্ণ দেহাবশেষ নিয়ে লতাগুল্মের আড়ালে এটা বোধহয় কয়েক শতাব্দী ধরে অসূর্যম্পর্শ্যা হয়ে পড়ে আছে। কেদার মজুমদার যখন বদ্রীকে নিয়ে ভগ্নস্তূপ পরিষ্কারে ব্যস্ত, তখন চন্দ্রনাথবাবু ঘুরে ঘুরে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কতকগুলো জায়গা। কিছু চিহ্ন, ইটের ওপর খোদাই করা লিপি, ভাঙা পাত্র, একটা দেবমূর্তির মাথা এরই মধ্যে উনি বার করে ফেলেছেন। ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। এবার উনি বললেন, আচ্ছা, এই ভাঙা বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণটা খুঁজে বের করতে হবে।

তবে এই পুরো বাড়িটা আগে পরিষ্কার করা দরকার। উত্তর-পশ্চিম কোণটা কাঁটাঝোপ আর ছোটোখাটো হেঁতালের বনে মানুষের পৌঁছনোর অযোগ্য হয়ে রয়েছে। এই কাজ আজকে আর করা সম্ভব নয়। এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।

চন্দ্রনাথবাবুর আরও খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজির ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেদারের ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা আর ডিটারমিনেশনের কাছে নিজের ইচ্ছাকে উনি খানিকটা গুটিয়েই নিলেন। তিনজন যখন এম ভি গঙ্গায় ফিরল, তখন ঘড়িতে বাজে বেলা সাড়ে তিনটে। কেদার এবং বদ্রী খাওয়া-দাওয়ার পর একটা লম্বা ঘুম দিল। উঠল সন্ধ্যে সাতটায়। সন্ধ্যের সময় চা আর সামান্য স্ন্যাকস্ খেয়ে কেদার বদ্রীর সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক কথা বললেন। লঞ্চটাও ভাল করে ঘুরে দেখলেন। লঞ্চের সারেঙ, ইঞ্জিনম্যান, রাঁধুনি বামুনের সঙ্গেও আলাদা আলাদা করে কথা বললেন। সাড়ে দশটা নাগাদ রাতের খাওয়া খেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে বললেন, দারুণ টায়ার্ড লাগছে। শুয়ে পড়ছি। এবং যথার্থই নিজের কেবিনে গিয়ে কেদার বদ্রীকে বললেন, শুয়ে পড়। কোন কিছু ভাবতে হবে না। আপাতত কিছু চিন্তা-ভাবনা করার নেই। চন্দ্রনাথবাবুর নিজের

ভাবনা এখন। উনিই ভাবুন। যতটা সম্ভব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিই। কারণ এখন আমরা চন্দ্রনাথবাবুর অধীনেই কাজ করছি।

রাত্রি তখন একটা। বদ্রী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কেদারদার ডাকে বদ্রীর ঘুম ভেঙে গেল। বদ্রী ধড়মড় করে উঠে বসল। কেদারদা বললেন, চুপ চুপ! বাইরে দ্যাখ!

বদ্রী বাইরে তাকাল। দেখল জ্যোৎস্নালোকিত নদীর বুকে আর একটা লঞ্চ অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা দূরে। তবে লুকিয়ে নয়। লঞ্চের নামটা পড়া যাচ্ছে না। ওই লঞ্চ থেকে তিনবার আলোর সঙ্কেত করা হল। তারপরই একটা ডিঙি নৌকো করে দুজন লোক চলে এল এম ভি গঙ্গাতে। বদ্রী চট্ করে নিচে নেমে কেবিনের দরজায় কান পাতল। চন্দ্রনাথবাবুর কেবিনের দরজা খোলার শব্দ। ফিসফাস কথার আওয়াজ। চন্দ্রনাথবাবুর গলার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছিল। মিনিটদশেক বাদেই ওই দু'জন লোককে নিয়ে ডিঙি নৌকোটা চলে গেল দূরে দাঁড়ানো লঞ্চটার দিকে। খানিক পর সেই লঞ্চটাও রহস্যময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীর রহস্যকে আরও গাঢ় করে দিয়ে খাঁড়ির দিকে আরও গভীরে চলে গেল। বদ্রীর কানে লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দটা রেকর্ড হয়ে রইল। গভীর রাতে কেদার মজুমদার বদ্রীকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বদ্রী তার দেখা এবং অনুভব করা যাবতীয় ঘটনা কেদারদাকে জানাল। ছক কষা হল আগামী দিনের কাজের।

পরের দিন সকালে ওরা তিনজন ফের জঙ্গলে নামার জন্য তৈরি হয়ে গেল। কিছু শুকনো খাবার সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল তখন। বদ্রী ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে দু'পাশের বন আর অনবরত ছুটে-চলা জলরাশি দেখছিল। আজকে এক অস্বস্তিকর চিন্তা ওকে পেয়ে বসেছে। ও ভাবছিল, যে কাজে ওরা এসেছে, তা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? গতরাতে কারা এসেছিল লঞ্চে? কেদারদাও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছেন না পরবর্তী ঘটনা কোন্ দিকে টার্ন নেবে। এইসব ভাবতে ভাবতে বদ্রী একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তখনই ওর মনে হল, ওরা যেদিক দিয়ে এসেছে, সেই হলদি নদীর দিক থেকে কোন একটা লঞ্চ এগিয়ে আসছে। বদ্রীনারায়ণ চোখ বুঝে পারিপার্শ্বিককে ভুলে, ধরতে চেষ্টা করল শব্দটা। হ্যাঁ, লঞ্চেরই শব্দ। তবে গতরাতের লঞ্চটা নয়। এটা আর একটা লঞ্চ। বদ্রীর দুশ্চিন্তা হল। ও নিচে নেমে এল। কেবিনে ঢুকে দেখল, কেদার জামা-প্যান্ট-রাবারের বুট পরে জঙ্গলে নামার জন্য তৈরি।

বদ্রী চিন্তিতভাবে বলল, কেদারদা, এবার এদিক দিয়ে আর-একটা লঞ্চের শব্দ পেলাম। সব দিক দিয়েই ওরা ঘিরে ধরছে নাকি?

কথাটা শুনে কেদার খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ছোট কোল্ট রিভলভারটা বালিশের তলা থেকে কোমরে গুঁজে নিলেন। বললেন, যত জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারবে তুমি, গোয়েন্দা হিসেবে ততই নিজেকে আরও উঁচুতে নিয়ে যেতে পারবে। ডোন্ট গেট নার্ভাস। হারি আপ!

আজকে তিনজন মিলে পুরো চারটে ঘণ্টা অবিশ্রাম কাজ করে পুরো ভগ্নস্তূপটা পরিষ্কার করে ফেলল। এখন পুরো বাড়িটাকে বোঝা যাচ্ছিল। এর পর কেদার মজুমদার পুবমুখী দাঁড়িয়ে বাড়িটার অবস্থান বুঝে নিল। তারপর বের করা হল উত্তর-পশ্চিম কোণ। কেদার মজুমদার এবার চন্দ্রনাথবাবুকে ডাকলেন। বললেন, এই যে আপনার উত্তর-পশ্চিম কোণ। দেখুন, সাত রাজার ধন পান কি না!

অট্টালিকার উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে সাড়ে তিন হাত ছেড়ে দক্ষিণ দিকের ডিরেকশনে একটা জায়গা চিহ্নিত করলেন চন্দ্রনাথবাবু। একটু রেস্ট নিয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসা শুকনো খাবার আর ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসা চা খেয়ে ওরা আবার খোঁড়ার কাজ শুরু করল। এর পরই দু'ঘণ্টা খোঁড়ার কাজ চলল। কোনও কিছু পাওয়া গেল না। কেদার মজুমদার খানিকটা হতাশ হয়েই বললেন, অনর্থক পরিশ্রম।

না! অনর্থক পরিশ্রম নয়! চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রনাথ বর্ধন। চন্দ্রনাথ বর্ধন হিসেবে ভুল করে না।

খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে আবার খোঁড়ার কাজ চলল। বদ্রী চারধারটা নজর রাখছিল। আবার কেদারদাকে সাহায্যও করছিল। চন্দ্রনাথবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জঙ্গলের চারদিক নজর রাখছিলেন অভিজ্ঞ মানুষের মতো। খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎই খটাং করে আওয়াজ হল। কেদার মজুমদারের গাঁইতিটা প্রবল বাধা পেয়ে ছিটকে গেল দশ-বারো হাত দূরে। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন চন্দ্রবাথবাবু। ওর কপাল ঘেঁষে চলে গেল গাঁইতিটা। এবার চন্দ্রনাথবাবু চেঁচালেন, ওই তো! দেখুন, দেখুন! কিসে শব্দ হল?

বদ্রী ছুটে গিয়ে গাঁইতিটা নিয়ে এল। কেদার এবার খুব সাবধানে গাঁইতি দিয়ে খোঁড়া জায়গার মাটি সরাতে শুরু করলেন। একটা শক্ত জিনিস ঠেকল। কেদার বললেন, বদ্রী, নাম তো গর্তে।

বদ্রী নামল। বেলচা দিয়ে মাটি তুলে তুলে দেখা গেল একটা লোহার বাক্স। বেশ বড় বাক্স। বদ্রী চিৎকার করে বলল, সিন্দুক!

কিন্তু তিনজনে মিলে কোনও মতেই ওরা বাক্সটা ওপরে তুলতে পারল না। চন্দ্রনাথবাবু চিৎকার করছিলেন, উত্তেজনায় ছটফট করছিলেন। কেদার কিন্তু শান্তভাবে সিন্দুকের তলার দিকে গাঁইতির চাড় দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টা করলেন। তিনজনেরই গলদঘর্ম অবস্থা। বদ্রী গর্ত থেকে মাটি তুলতে তুলতে তিনটে মাটি-মাখা রুপোর টাকা পেল। চন্দ্রনাথবাবু বললেন, আমি কোন ভুল করিনি। এখানেই রাজা চিরঞ্জীবকেতু জলদস্যুদের ভয়ে তার কোষাগারের সম্পদ মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছিলেন। জয় শ্রীগঙ্গা!

ওদের ফিরে আসতে হল লঞ্চে। অগত্যা। এখন বাজে বিকেল চারটে আঠাশ মিনিট। আর একটু পরেই সূর্য দ্রুত পশ্চিমে নেমে যাবে। এখন আর জঙ্গলে নেমে কাজ করা সম্ভব নয়। চন্দ্রানাথবাবুর আর তর সইছিল না। স্টিমারের খালাসীদের বলে তিনি দড়িদড়া জোগাড় করে ফেলেছেন। কী আছে সিন্দুকে? প্রাচীন মুদ্রা? সোনা-রূপা? নাকি হীরে-মুক্তো-মণি-মাণিক্য? এইসব নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল তিনজনেরই মনে। কেদার চুপচাপই ছিলেন। ছটফট করছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। বদ্রীর মনের চাপা উত্তেজনা বোঝা যাচ্ছিল। রাতটা কেটে গেল এভাবেই। তবে কেদার আর বদ্রী রাতভর অ্যালার্ট রইল। পালা করে জাগল সারা রাত। বদ্রীর কেবলই মনে হতে লাগল, সামনে বিপদ আসছে। আসছেই!

ভোরবেলা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখনই অঘটন ঘটল। হই-হট্টগোলে ঘুম ভেঙে গেল দুজনেরই। বদ্রী জানালা দিয়ে দেখল, আর একটা লঞ্চ এম ভি গঙ্গার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ওপরে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। পলকে অবস্থা বুঝে কেদার ঝোলা থেকে রেডিওর মত কী একটা বের করল। বদ্রী দেখেই বুঝল, এটা ওয়াকি টকি। দ্রুত সুইচ টিপল কেদার। বলল, হ্যালো! আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেদার মজুমদার বলছি! আমাদের লঞ্চ আক্রমণ—

মেসেজটা পাঠানো শেষ হবার আগেই কেবিনের দরজায় প্রবল ধাক্কা। চন্দ্রনাথবাবুর গলা পাওয়া গেল, কেদারবাবু! দরজা খুলুন! শব্দ পেয়েই কেদার ওয়াকি টকির সুইচ অন অবস্থাতেই বেডের নিচে অন্ধকার কোণে ফেলে দিলেন। বদ্রী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কেদার দরজার ছিটকিনি খোলামাত্রই চন্দ্রনাথবাবু কেবিনে ঢুকে পড়লেন। বললেন, কেদারবাবু, এরা আমারই লোকজন। এরা এসে গেছে। এই যে, এ হল জগন। ও আমারই কাজ করে। খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। চন্দ্রনাথবাবুর কথায় প্রচ্ছন্ন হুমকি।

কেদার মজুমদার জগনের দিকে তাকালেন। দেখলেন, জগন হাতে একটা রিভলবার নিয়ে দোলাচ্ছে। কেদার মজুমদার বললেন, আমি আন্দাজ করছিলাম আপনার আরও লোকজন কাছাকাছি আছে। আর এই যে এম ভি চন্দ্রকেতু লঞ্চটা, তার মালিকও আপনি।

তাই নাকি! আপনি তাহলে আরও অনেক খবরই জেনেছেন ধরে নিচ্ছি। গঙ্গু! একে একটু সার্চ কর তো!

বদ্রী গঙ্গুকে দেখেই চিনল। এই লোকটাই কলেজ স্ট্রিটে ওদের ওপর হামলা করেছিল। গঙ্গু এগিয়ে আসতেই কেদার ওকে এক জুডোর প্যাঁচে উল্টে ফেলে দিলেন বেডের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে জগন রিভলভার তুলল। চন্দ্রনাথবাবু জগনকে আটকালেন। না, না। কোন রক্তারক্তি নয়। এখনও অনেক কাজ বাকি। কেদারবাবু! আমরা কোন ঝামেলায় যেতে চাইছি না! আমরা আপনাকে সার্চ করে রিভলভারটা নিয়ে নিচ্ছি। আপসে দিলে আরও ভাল। বদ্রী! তোমার পকেট থেকে ওই দুমুখো ছুরিটাও দিয়ে-দাও।

কেদার বদ্রীকে বললেন, ছুরিটা দিয়ে দে বদ্রী। এবং নিজেও কোমরে গোঁজা রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন চন্দ্রনাথবাবুর দিকে।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, কেদারবাবু, আপনার পৌরুষে আঘাত করে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ নিতে প্রভোক করেছিলাম। কারণ, আপনাকে আমার প্রয়োজন ছিল। আমরা এখন আবার জঙ্গলে যাব। এবার খোঁড়াখুঁড়ির কাজ আমার লোকজনই করবে। শুধুমাত্র সরকারি তরফে যাতে কোন বাধা না আসে, তার জন্য আপনারা জামিন থাকবেন। আমরা এক্ষুণি নামব। আপনি আর বদ্রী শুধু আমাদের পাহারায় জামিনবন্দি হিসেবে সঙ্গে থাকবেন। আর আপনার সঙ্গে থাকা ম্যাপটাও আমাদের দিতে হবে। ওটা আমাদের দরকার।

কেদারবাবু এবং বদ্রীনারয়ণকে পাহারা দিতে লাগল গালকাটা ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা। ওর হাতে পাইপগান। কোমরে গোঁজা একখানা বাঁকানো ছুরি। লোকটা হিন্দিতে কথা বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জঙ্গলে নামল। কেদার-বদ্রী জুটিকেও নামানো হল। কেদার বদ্রীকে আস্তে করে বললেন, বি স্টেডি বদ্রী। ঘাবড়াবি না। আমার হাতে এখন অনেক খেলা। শুধু আমার মুভমেণ্ট লক্ষ্য রাখবি। ওরা কী করছে, ক'খানা অস্ত্র আছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করবি। আমার প্রয়োজনীয় কাজটা বুঝে নেবার চেষ্টা করবি। বি অ্যালার্ট!

.

বোঝা গেল, জগন অ্যাণ্ড হিজ গ্রুপ এ সব ব্যাপারে যথেষ্ট পারদর্শী।

দুপুর দুটোর মধ্যেই ওরা সিন্দুকটা ওপরে তুলে ফেলল। একটা কলসি পাওয়া গেল। চন্দ্রনাথ বর্ধনের মতে, ওটা অষ্টধাতুর। আরও কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেল। মুদ্রায় বরাভয়দাত্রী এক দেবীমূর্তি রয়েছে। কিন্তু সিন্দুকটা ওরা কোনভাবেই খুলতে পারল না। বেলচা, গাঁইতি, শাবল কিছু দিয়েই খোলা গেল না। তখন জগন. বলল, ডিনামাইট চার্জ করে দেখি।

চন্দ্রনাথ বর্ধন বাধা দিল না! কাছেই হলদিবাড়ি ফরেস্টের বীট অফিস। ডিনামাইটের শব্দে ওদের সার্চপার্টি খুঁজতে চলে আসবে এখানে।

ওরা সশস্ত্র। কেদার বদ্রীকে এর ফাঁকেই আস্তে করে বলে দিলেন, কাল পর্যন্ত আমরা চন্দ্রনাথ বর্ধনের হয়ে কাজ করেছি। আজ থেকে আমরা নিজেদের বিবেক অনুযায়ী কাজ করব। আর যে সব পুরাতত্ত্ব আমরা উদ্ধার করেছি, সেগুলো যাতে ভারতীয় যাদুঘরের সম্পত্তি হয়, সে ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

বদ্রী সংশয়ী গলায় বলল, কী করে হবে ?

কেদার মজুমদার এখন আরও বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে, ধীরে এবং খুব আস্তে করে বললেন, ওই বুড়ো চন্দ্রনাথ জ্ঞানী, গবেষক, কিন্তু উন্মাদ। উদ্ভট ওর চিন্তা-ভাবনা। আর ওগুলো সব ভাড়াটে গুণ্ডা। ওদের হাতে এই পুরাকীর্তি কেদার মজুমদার প্রাণ থাকতেও তুলে দেবে না।

বদ্রী লক্ষ্য করল, কেদারদার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। তাঁর দীর্ঘ কিন্তু ঋজু চেহারাটা টানটান হয়ে উঠেছে। শক্ত হয়ে উঠেছে হাতের মুঠি। কেদার আবার বললেন, ফাইট করতে হবে বদ্রী। ফাইট! কারণ, এরা খুনী। খুনীদের কোন সুযোগ দেওয়া চলবে না।

বদ্রী কেদার মজুমদারের কথায় ভরসা পেল। কেদারদার গলায় আছে এক অদ্ভুত জাদু। সেই জাদু নার্ভাসনেস কাটিয়ে দেয় সম্মোহনের মত মানসিক শক্তি দিয়ে। কেদার বললেন, বি অ্যালার্ট বদ্রী!

বদ্রী বলল, ইয়েস! আই অ্যাম রেডি!

বদ্রী একটা জিনিস লক্ষ্য করছিল। লোকগুলো চন্দ্রনাথ বর্ধনের চেয়ে জগনের নির্দেশকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। যখন উদ্ধার করা জিনিসপত্র খাঁড়ির পাশে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তা বোঝা গেল। চন্দ্রনাথ বর্ধন বলল, সমস্ত মাল এম ভি গঙ্গায় তোল। কিন্তু জগন বলল, না! সব চন্দ্রকেতুতে উঠবে। কথাটা শুনে চন্দ্রনাথ বর্ধন ভূঁরু কোঁচকাল। চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। তবু বেশি কিছু বলল না। সমস্ত জিনিস এম ভি চন্দ্রকেতু লঞ্চে তোলা হল।

এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সমস্ত বিষয়টার নেতৃত্ব চলে গেল জগনের হাতে। কেদার বদ্রীকে বলল, দেখবি বদ্রী, তবুও এই বুড়োকে এম ভি গঙ্গাতেই উঠতে হবে। কেন ? সে কথা পরে বলব। এবং সত্যিই দেখা গেল, চন্দ্রনাথ বর্ধন কিন্তু এম ভি গঙ্গাতেই উঠল। কেদার-বদ্রী জুটিকে সেই গালকাটার পাহারায় এম ভি গঙ্গাতেই তোলা হল। বদ্রী আর কেদারকে ওদের কেবিনে ঢুকিয়ে দিয়ে চন্দ্রনাথ গালকাটা পাইপগান হাতে ধরা লোকটাকে কেবিনের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর বলল, কেদারবাবু! কোন চালাকি না করলে আপনাকে আমি কিছু বলব না। কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে মৃত্যু চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি। এই সামশেরকে আমি ইঙ্গিত করলে ট্রিগার টিপতে এক সেকেণ্ডও দেরি করবে না।

ওদিকে এম ভি চন্দ্রকেতু স্টার্ট করে দিয়েছে। বদ্রী কেবিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। দেখলো, উল্টো দিক ধরে খুব দ্রুত রওনা দিল লঞ্চটা। এবং নিমেষেই অদৃশ্য হয়ে গেল। বদ্রী জিজ্ঞেস করলো, কেদারদা, ওরা ওদিকে কোথায় যাচ্ছে? গালকাটা পাহারাদার আওয়াজ পেয়ে গর্জন করে উঠল, চোপ! কোন বাতচিৎ চলবে না। ফিন বা'ত শুনেগা তো কুত্তাকা মাফিক লাথ মারেগা।

শুনে কেদারের চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। পরমুহূর্তেই কেদার অদ্ভুত শীতল হয়ে গেলেন। আর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, তোমার বাবুকে বল, আমি বাথরুম যাব।

শুনে লোকটা এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর এগিয়ে গেল সামনের দিকে। মুহূর্তেই ইয়েলো বেল্ট ক্যারাটে মাস্টার কেদার মজুমদার নিঃশব্দে বেড থেকে নেমে শ্বাপদের চেয়েও শব্দহীন দ্রুতগতিতে লোকটার পেছন থেকে বজ্রমুঠিতে গলা চেপে ধরলেন। সামান্য গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া কিছু বের হল না লোকটার গলা থেকে। পাইপগানটা হাত থেকে পড়ে গেছে। এবার বাঁ হাতে গলাটা ধরে কেদার ডানহাত দিয়ে লোকটার কপালের বিশেষ একটা নার্ভে আঘাত করা মাত্রই অজ্ঞান হয়ে গেল ও। বদ্রী ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে। পাইপগানটা হাতে তুলে নিয়েছে।

কেদার বললেন, বদ্রী, ট্রিগারে হাত দিস না। খুব বাজে অস্ত্র। ঠিকমত এম করা যায় না। শুধু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। বলেই উনি কেবিনে ঢুকে বেডের নিচ থেকে ওয়াকিটকিটা বের করলেন। ওয়াকিটকির সুইচ অন করা ছিল। ফলে ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। কেদার দ্রুত ঝোলা থেকে নতুন ব্যাটারি বের করে, লাগিয়ে চালু করে দিলেন ওয়াকিটকি।

হ্যালো! গোসাবা পুলিস লঞ্চ! আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেদার মজুমদার বলছি। ওভার!

গোসাবা পুলিস বলছি। আমাদের লঞ্চ হলদি নদীতে। শুনতে পাচ্ছেন? আপনাদের অবস্থানটা জানান। ওভার!

হলদি নদী ধরে সামনের দিকে এগিয়ে ডানদিকে সবচেয়ে বড় খাঁড়িটায় চলে আসুন। খাঁড়ির মুখটা ইংরেজি 'এস'-এর মত। ওভার।

বুঝেছি। আমরা সাত থেকে দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। কোনও ইনফরমেশন আছে? ওভার।

জানান না দিয়ে আসার চেষ্টা করুন। দ্রুত লঞ্চটা দখল নেবার জন্য রেডি হয়ে থাকুন। কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। লাইন কেটে দিচ্ছি। ওভার!

ওয়াকিটকি রেখে কেদার বদ্রীকে বললেন, চন্দ্রনাথবুড়োর ঘরে দড়ি আছে। কেউ দেখার আগে এটাকে বুড়োর কেবিনে ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল। নে। আমি ধরছি।

কাজটা দ্রুত শেষ করে কেদার চিৎকার করে বললেন, এই যে চন্দ্রনাথবাবু! দেখুন! আপনার সামশেরের কী হয়েছে!

চন্দ্রনাথ বর্ধন যথেষ্ট সতর্ক। সারেঙকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রনাথবাবু নিচে নামলেন। কেদার চন্দ্রনাথকে কেবিনে ঢুকতে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ালেন। সারেঙ চন্দ্রনাথের পেছনে। বদ্রী এবার উল্টোদিকের কেবিন থেকে বেরিয়ে সারেঙের পেছনে পাইপগানের নলটা ঠেকিয়ে ধরে বলল, একটুও নড়ার চেষ্টা কোরো না।

কেদার চন্দ্রনাথকে বললেন, আপনি কেবিনে ঢুকুন। চুপচাপ থাকুন।

একটা লঞ্চের ভারী ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই লঞ্চটা এম ভি গঙ্গার গায়ে এসে ভিড়ল। ততোধিক ক্ষিপ্রতায় একডজন বন্দুকধারী পুলিস লাফিয়ে পড়ল এম ভি গঙ্গায়। ওপরে তখন কেউই ছিল না। থানার সেকেণ্ড অফিসার রিভলভার হাতে নিচে নামলেন। সারেঙ আর চন্দ্রনাথবাবুকে অ্যারেস্ট করা হল। কেদার সেকেণ্ড অফিসারকে বললেন, আপনাদের কাছে লঞ্চ চালানোর মত এক্সট্রা কেউ আছে নাকি?

না। কেউ নেই। আমি হলদিবাড়ি ফরেস্টে মেসেজ পাঠাচ্ছি। ওদের ওখানে দু-তিনজন চালক আছে।

হলদিবাড়ি থেকে একটা ছোট বোটে একজন লঞ্চচালককে আনতে আরও

পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে গেল। তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু বনাঞ্চলে এখনও যথেষ্ট আলো আছে। কেদার সেকেণ্ড অফিসারকে বললেন, আমি একটা সাজেশন রাখছি অফিসার! আপনারা আগের রাস্তা দিয়ে গিয়ে নদীর মুখটা ব্লক করে ফেলুন। আমার সঙ্গে ছ'জন কনস্টেবল দিন। বীট অফিসের দুজনকে আমার সঙ্গে দিন। ওরা পথ চিনে যেতে পারবে। যা করতে হবে কুইক করতে হবে।

ঠিক আছে। আমাদের লঞ্চ আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে নদী ব্লক করে রাখছে। কিন্তু আমি এম ভি গঙ্গাতেই থাকতে চাই। ছ'জন কনস্টেবল আমাদের সঙ্গে থাকুক।

সাত

প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হল। গালকাটা লোকটা, চন্দ্রনাথ বর্ধন এবং এম ভি গঙ্গার সারেঙকে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিস লঞ্চে তোলা হল। পুলিস লঞ্চ আর হলদিবাড়ি ফরেস্টের মোটর-বোটটা রওনা দিল। পাঁচ মিনিট পরেই ফরেস্টের সারেঙ এম ভি গঙ্গাকে নিয়ে রওনা হল উল্টোদিকে। এখন ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। খাঁড়ি পেরিয়ে এম ভি গঙ্গা যখন ওদিকের নদীতে পড়ল, তখন সন্ধ্যা। কেদার ধরেই নিলেন, জগনের লঞ্চ ডানদিক ধরে গিয়ে ফের হলদি নদীতে যাবার চেষ্টা করবে। উনি লঞ্চচালককে ডানদিক ধরে এগোতে বললেন। পুলিস অফিসার ওপরে ছিলেন। কেদার বললেন, আপনারা নিচে থাকুন। আর আপনি হুইলরুমের পেছনের কেবিনটায় থাকুন। ক্রিমিনালগুলো আপনাদের দেখে অ্যালার্ট হয়ে যাবে। বরং ওদের অসতর্ক অবস্থায় অ্যাটাক করতে পারলে প্রতিরোধ কম আসবে। রক্তারক্তির সম্ভাবনা কম থাকবে।

বদ্রী মাস্তলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বেশ খানিকক্ষণ পরেই চেঁচিয়ে বলল, কেদারদা! ওই যে এম ভি চন্দ্রকেতু। আস্তে আস্তে চলছে। সব আলো নেভানো। কেদার মজুমদারও লঞ্চটা দেখতে পেয়েছেন। কেদার লঞ্চ-চালককে ফুল স্পিডে লঞ্চ চালাতে বললেন। লঞ্চ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এম ভি চন্দ্রকেতুকে ছুঁয়ে ফেলল। জগন দাঁড়িয়েছিল মাস্তলের কাছে। হাতে রিভলভার। হুইলরুমের আলো নেভানো থাকাতে ও এম ভি গঙ্গার চালককে

দেখতে পাচ্ছিল না। খানিকটা সন্দেহের চোখেই ও চিৎকার করে বলল, কি হল!

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। জগন ফের জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

এদিকে জগনের এক সাকরেদ বন্দুকধারী এক কনস্টেবলকে দেখে ফেলেছে। ও চিৎকার করল, ওস্তাদ! পুলিস!

জগন পিছু ফিরল। কোথায়?

মুহূর্তে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন সেকেণ্ড অফিসার। জগনের মুখে বাঁ হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ধরে ডানহাতে জগনের রিভলভার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। জগনের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ল। এম ভি গঙ্গা থেকে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে কেদার জগনের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন। বন্দুকধারী কনস্টেবলরাও এম ভি চন্দ্রকেতুতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেউ বিশেষ জুত করবার আগেই প্রায় সবাই কাৎ। জগন আর কেদার মজুমদার মাস্তুলের সামনে জাপটাজাপটি করছে। কেউ কম যায় না। বদ্রী তখন ছুটে নিচে নেমে গেছে। ওয়াকিটকির বোতাম টিপে আনাড়ি হাতে সেটা ধরে ও চিৎকার করে বলতে লাগল, হ্যালো, হ্যালো! আমি এম ভি গঙ্গা থেকে বলছি। ক্রিমিনালগুলোকে ধরা হয়েছে। আপনারা তাড়াতাড়ি আসুন! ওভার!

জগন প্রচণ্ড শক্তি ধরে। জুডো-ক্যারাটেতে সেও ওস্তাদ। কেদার মজুমদারের সবকটা প্যাঁচ ও কাটিয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাল্টা প্যাঁচে কেদার মজুমদারকেও ফেলে দিচ্ছিল। দু'জন শক্তিমান পুরুষের লড়াইয়ে সারা লঞ্চটা কাঁপছিল। দোল খাচ্ছিল। ঠিক তখনই এম ভি চন্দ্রকেতুর দাড়িওয়ালা সেই সারেঙ একটা লম্বা ভোজালি নিয়ে কেদার মজুমদারের দিকে ছুটে এল।

গুডুম! গুলির শব্দে চমকালো সবাই। সেকেণ্ড অফিসার লোকটার হাতে গুলি করেছেন। চিৎকার করে বাঁহাত দিয়ে ডানহাত চেপে ধরে লোকটা বসে পড়ল। কেদার একমুহূর্ত অন্যমনস্ক হলেন। এই সুযোগে জগন সোজা কেদার মজুমদারের চোয়াল লক্ষ্য করে এক ঘুঁসি ছুঁড়ে নদীতে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে সঙ্গেই টর্চের আলো ফেললেন অফিসার। কিন্তু জগন আর মাথা তুলল না। অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, ও তো কুমিরের পেটে যাবে!

কেদার তখনও হাঁপাচ্ছিলেন। তার মধ্যেই বললেন, না না। ও কুমিরের পেটে যাবে না। এবারও পালাল জগনলাল।

লঞ্চের সবাইকেই তখন কাবু করে ফেলা হয়েছে। খানিকক্ষণ পরে জোরালো সার্চলাইট জ্বেলে গোসাবা পুলিসের লঞ্চটা চলে এল।

আট

চন্দ্রালোকিত রাত্রি। সুন্দরবনের নিবিড় বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা নদী পেরিয়ে ছুটে চলেছে তিনটে লঞ্চ। এম ভি গঙ্গা, এম ভি চন্দ্রকেতু এবং গোসাবা পুলিসের লঞ্চটা। যাদের ধরা হয়েছে, সবাইকার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিস-লঞ্চের গারদখানায় রাখা হয়েছে। বারোজন বন্দুকধারী কনস্টেবল তিনটে লঞ্চকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেদারবাবু, সেকেণ্ড অফিসার দেবকুমার ভট্টাচার্য এবং বদ্রীনারায়ণ এম ভি চন্দ্রকেতুর হুইলরুমের সামনের প্যাসেজটায় তিনটে চেয়ার নিয়ে বসেছিল। তিনজনেরই ছিল রিল্যাক্স মুড। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কেদার মজুমদার বললেন, উদ্দেশ্য সৎ না হলে অনেক তিতিক্ষার ফলাফল যে ভাল হতে পারে না, তার অন্যতম উদাহরণ চন্দ্রনাথ বর্ধন।

কি রকম ?

চন্দ্রনাথ বর্ধনের দীর্ঘ গবেষণার পেছনে একটা উদ্ভট আকাঙ্ক্ষা ছিল। তা হল সুন্দরবন এলাকার পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে এখানকার শাসন চালানো।

বলেন কী ? —অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সেকেণ্ড অফিসার দেবকুমার ভট্টাচার্য।

হ্যাঁ। আমাদের বদ্রী ওর কেবিনে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব দলিল-দস্তাবেজ উদ্ধার করেছে, তাতে মনে হয়, চন্দ্রনাথ বর্ধন এই অঞ্চলের প্রাচীন রাজা চন্দ্রকেতুর বংশধর হলেও হতে পারেন। রাজা চন্দ্রকেতু অবধি ইতিহাসে ঠিক আছে। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে রাজা চিরঞ্জীবকেতুর অংশটা উনি গল্প বানিয়েছেন।

তাহলে জগন কে ? —বদ্রী প্রশ্ন করল।

জগন সুন্দরবন এলাকার চোরাচালানকারি চক্র ও ক্রিমিনাল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। নটোরিয়াস লোক। এটা পুলিসের খবর। চন্দ্রনাথ বর্ধন একে টাকা দিয়েই রেখেছিলেন।

এত টাকা চন্দ্রনাথ বর্ধন পেত কোথা থেকে ?

সম্ভবত কোনও বিদেশি সংস্থা টাকা দিত। যারা ভারতবর্ষের শান্তি চায় না। সেটা পুলিস তদন্ত করলে বুঝতে পারবে। আর একটা জিনিস আমি অনেক পরে বুঝেছি। চন্দ্রনাথ বর্ধন কথাটা চেপে রেখেছিল।

কী সেটা ?

চন্দ্রনাথ বর্ধন চোখে খুব কম দেখে। ও খুব কাছে থেকে খাঁড়ির ইংরেজি 'এস' আকারটা দেখতে পাচ্ছিল না। নিচে নেমে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া ম্যাপ দেখতেও আমার সাহায্য নিয়েছিল বাধ্য হয়েই।

চন্দ্রনাথবাবু আপনাকে কাজে নিল কেন ? এটা তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না !

এখানে দু'রকম খেলা আছে। চন্দ্রনাথ বর্ধন ভয়ঙ্কর কুটিল মানুষ। উনি চোখে কম দেখেন। এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে জগন। সেইজন্য আমাদের সাহায্য ওর দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, আমরা কিছুদিন আগে এখানে যে সফল অভিযান চালিয়েছিলাম, আমাদের সেই ক্রেডিটটাকে ও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল।

কী রকম ?

যেমন ও আমাদের জামিন রেখে পুলিসের সামনে দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসগুলো স্মুথলি নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু জগন তো বিট্রে করা শুরু করেছিল ?

জগন পারত না। দু'টো লঞ্চের সবাই চন্দ্রনাথের লোক। চন্দ্রনাথের বিশ্বাসে ওরা বিশ্বাসী। ওরা জগনের বিশ্বাসঘাতকতা ভেঙে দিত। এবং কার্যত বুদ্ধিমান জগন একটা রফা করে নিতই।

কেদারদা, আপনি বলছিলেন, যত যাই হোক, চন্দ্রনাথ বর্ধন এম ভি গঙ্গা ছেড়ে যাবে না। কেন ?

ওর বিশ্বাস, ওর সমস্ত কাজকর্ম, দলিল-দস্তাবেজ, প্রমাণিত তথ্য, সব কিছু সেখানে। প্রাণ গেলেও সেগুলো ও ছাড়বে না। তা হলে ওর চিন্তার ভিতটাই নড়ে উঠবে। আর বদ্রী, এবার বুঝেছিস তো, গোসাবায় আমার এত সময় লেগেছিল কেন ? আমাকে ওই সময়টুকুর মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক সাজাতে হয়েছে থানায় বসে। আর ওয়াকিটকিটা থানার সৌজন্যে প্রাপ্ত। সবশেষে একটা কাজ আছে।

কী কাজ ?

আমার সঙ্গে নিচে যেতে হবে। চন্দ্রনাথ বর্ধনের কেবিনে।

চলুন।

ওরা সবাই চন্দ্রনাথ বর্ধনের কেবিনে গেল। কেদারবাবু বললেন, ওই কাগজের বাণ্ডিলগুলো বের করে ফেলুন। বদ্রী, তুইও হাত লাগা। এগুলো

ছাপানো লিফলেট। এগুলো উনি এখানে মানুষজনের মধ্যে বিলি করবেন ঠিক করেছিলেন। মানুষের আবেগ, সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে লেখা এই লিফলেট মানুষে মানুষে বিভেদ লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। আসুন, এগুলো আমরা নদীতে বিসর্জন দিই।

কাগজের বাণ্ডিলগুলো খোলা হল। বদ্রীনারায়ণ এবং দেবকুমার ভট্টাচার্য দুজনেই লিফলেটটা পড়ে চমকে উঠল। সর্বনাশ! কী সাঙ্ঘাতিক! মানুষের প্রাচীন ঐতিহ্য, ধর্মবোধ নিয়ে কী ভয়ঙ্কর মিথ্যে ব্যাখ্যা।

ওরা আর দেরি করল না। বাণ্ডিল খুলে ওই বিষাক্ত কাগজগুলো নদীতে উড়িয়ে দিতে লাগল। বদ্রী বলল, ওই উদ্ধার করা প্রাচীন জিনিসগুলো কোথায় যাবে?

কেন? ওগুলো মিউজিয়ামে যাবে। ব্যস! এখানেই আমার কাজ শেষ। আমাকে এখন ভাল করে একগ্লাস চা খেতে হবে। দুধ ছাড়া শুধু লিকার চা।

তিনটে লঞ্চ তখন ভয়াল অরণ্যের মধ্য দিয়ে ছুটছে স্থলভাগের দিকে, জনপদের দিকে।

ছোবল

নিঃশব্দ মৃত্যু

প্রচণ্ড বৃষ্টির সঙ্গে ছিল দক্ষিণমুখী দারুণ ঝড়। শোঁ শোঁ শব্দে আর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় অন্য কিছু শোনা যাচ্ছিল না। কিচ্ছু না। পাঁচ হাত দূর থেকে জোরে চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছিল। আকাশ ভেঙে পড়বে নাকি! বাজ পড়ল। আবার বাজ পড়ল! আবার আকাশ ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে বারবার। গুড়-গুড়-গুড়-গুড় একটা শব্দ উঠল। বকুলরানি কান পাতল। ভূমিকম্প নাকি! নাকি প্রলয় আসবে? পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ল। বকুলরানি ঘরে একাই ছিল। এমন সময় দারুণ জোর শব্দ করে একটা জানালা খুলে গেল। হাওয়ার দাপটে ঘরের জিনিসপত্র ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। জানালার পাল্লাটা ঝড়ের ধাক্কায় বারে বারে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। পাল্লাটা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঘটাস ঘটাস করে দারুণ জোরে আর্তনাদ করে উঠছিল। বকুলরানির চোখের দৃষ্টি ছিল প্রখর। হাওয়ার স্রোত সামলে সে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ক্বড়-ক্বড়াৎ করে বিদ্যুৎ চমকালো। অজস্র আলোর ঝলকানি। প্রকৃতি-বাজিকরের খেলা। সামনের পাহাড়, রাস্তা সব পরিষ্কার দেখতে পেল বকুলরানি। পাহাড়ের গায়ে সেগুন গাছগুলো উন্মত্তের মতো দুলছে। আকাশটাকে অজস্র টুকরোয় ভাগ করে দিয়ে আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই আলোয় বকুলরানি দেখল একটা সেগুনগাছ ভেঙে পড়েছে। ঝড়ের প্রচণ্ড শব্দে গাছ ভাঙার শব্দ চাপা পড়ে গেছে। বকুলরানির মাথার পোকাটা ফের নড়ে উঠল। সে বিড়বিড় করে কী সব বলছিল....ওই আসছে! আসছে! ওরা আমায় থাকতে দেবে না। আমি যাব না। না, না-আ-আ-আ! ঝড়ের চোটে জানালার পাল্লাটা ফের জোরে শব্দ করে উঠল। বকুলরানি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ওর চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। বাইরে উঠোনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বকুলরানি ওকে চিনতে পারল। কিন্তু নাম মনে করতে পারল না।

মাসিমা, মাসিমা! দরজা খুলুন! ঝড়ের তীব্র ঝাপটায় বকুলরানি জানালার কাছ থেকে সরে এল। বকুলরানির মাথা ঝিমঝিম করছে। কে যেন বহুদূর থেকে ওকে মাসিমা মাসিমা বলে ডাকল। সে এবার হুঁশ ফিরে পেয়েছে। তাই তো! বাইরে তো মেয়েটা দাঁড়িয়ে! কিন্তু ও এখানে কেন? বকুলরানি সন্দেহ চোখ কোঁচকালো।

মাসিমা, মাসিমা! দরজা খুলুন! ঝড়-বৃষ্টিতে মরে যাব। —ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটা। বকুলরানির চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

না, না! বেরিয়ে যা!

বাঁচান! বাঁচান, মাসিমা!

আবার বিদ্যুৎ চমকালো। সেই বিদ্যুতের আলোয় উঠোনে দেখা গেল আর একটা মানুষের ছায়া। মানুষটা খোলা জানালার সোজাসুজি দৃষ্টিপথের আড়ালে দাঁড়িয়ে। বকুলরানির মাথার ঠিক নেই। সেই ছায়াটা দেখতে পেল না। মেয়েটা ততক্ষণে বারান্দায় উঠে এসেছে। বৃষ্টির জলে শাড়ি কাপড় চুপসে গেছে। জানালার দুটো শিক ধরে সে গোঁ গোঁ শব্দ করছিল। ঝড়-বৃষ্টির ধাক্কায় সে কাহিল। কাঁপছে ঠকঠক করে।

মাসিমা, দরজাটা একটু খুলুন মাসিমা! নইলে শীতে মরে যাব। বকুলরানির চোখ ততক্ষণে শান্ত হয়ে এসেছে। ঝড়ের চোটে তার ঘর এলোমেলো হয়ে গেছে। ঝাপটা সামলে সে দরজার কাছে এল। খিলটা খুলল। বকুলরানির জীবনে সর্বশেষ ভুল। খোলা দরজার সামনে কেউ নেই। বাতাসের ঝাপটা সয়ে নিয়ে বকুলরানি গলা বাড়িয়ে ডাকল, কি রে! কই গেলি! তক্ষুণি একটা রোমশ পুরুষালি হাত পাশ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে বকুলরানির গলা টিপে ধরল। বকুলরানির অস্ফুট চিৎকার, মৃত্যুযন্ত্রণার দাপাদাপি প্রকৃতির তাণ্ডবে হারিয়ে গেল। কেউ শুনতে পেল না। ঝড়-বৃষ্টি চলল অনেক রাত্র পর্যন্ত। সব কিছু কি উড়িয়ে নিয়ে যাবে! সব কিছু কি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে! মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় পাহাড়ের মাথায় ঝড়ের বীভৎস নাচ দেখা যাচ্ছিল। গাছগুলো সব যেন পাগল হয়ে গেছে। গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে বাতাসের দুরন্ত ঢেউ চলে যাচ্ছিল। বজ্রপাতে ক্ষত-বিক্ষত আকাশ। ভয়াল কালো মেঘগুলো ক্রমশ ভেসে যাচ্ছিল দক্ষিণদিকে। সেই রাতের দুর্যোগের পর থেকে আর বকুলরানিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ছোটনাগপুর মালভূমির পাহাড়ী এই গঞ্জে প্রত্যেকদিনের জীবনযাত্রা যেমন চলছিল, তেমনই চলল। কিন্তু আলোর নিচে অন্ধকারের মধ্যে অপরাধীরা ছুরি থেকে রক্ত মুছে ফেলে ফের আলোয় চলে এল। প্রত্যেকদিন সূর্য উঠছিল,

প্রত্যেকদিনই ডুবছিল। শুক্লপক্ষ থেকে কৃষ্ণপক্ষ ঘুরে ঘুরে আসছিল রাতে। এর পর কেটে গেছে আরও বছর দু'য়েক।

সন্দেহের ছায়া উঁকি দিল

বাগবাজারে কেদার মজুমদার অফিসে বসেছিলেন। টেবিলের মুখোমুখি বদ্রীনারায়ণ। সকাল আটটা। কেদার মজুমদারের সকালের এক্সারসাইজ হয়ে গেছে। গোপালের দোকানে টিফিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। ভিজে ছোলা চিবোচ্ছিল দু-জনেই। হঠাৎ কী মনে করে কেদার মজুমদার হাতে তুড়ি দিলেন। যাঃ ! ভুলেই গেছিলাম। বলেই ঘরের ভেতর থেকে একটা পাকা পেঁপে আর একটা ছুরি নিয়ে এলেন। একগাল হেসে বদ্রীকে বললেন, কাল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে পেঁপেটা কিনলাম। ছ-টাকা করে চাইছিল। দু-কিলো ওজন হল। দশ টাকা দিয়েই নিয়ে এলাম। ছুরিটা দিয়ে বেশ তাড়াতাড়ি পেঁপের খোসা ছাড়িয়ে ফেললেন কেদার। এদিকে গোপালের চায়ের দোকান থেকে স্যাঁকা পাউরুটি আর দুটো ডবল ডিমের পোঁচ এসে হাজির।

এই ঘণ্টা ! শুনছিস !

বাবু !

আধঘণ্টা বাদে দুটো দুধ ছাড়া লিকার চা দিয়ে যাবি।

লেবু দোবো ?

দিস ! থাকলে দিস।

পেঁপের টুকরোয় কামড় বসিয়ে কেদার মুখ খুললেন। যা বলছিলাম, কোন ব্যাপারেই হতাশ হবার জায়গা নেই। সম্ভাব্য সূত্রগুলোকে পরপর সাজিয়ে ফেলবি। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার লিঙ্ক কতটা দেখবি। সেখানে গড়মিল থাকলে নোট করবি। কোন ঘটনা বা জবানবন্দিতে গোলমাল দেখলেই সেগুলোকে সন্দেহজনক তালিকায় রাখবি। ব্যস ! জট খুলতে শুরু করবে।

কিন্তু অনেক সময় কিছুটা এগিয়ে ধাঁধায় পড়ে যাই।

তাহলে ধরতে হবে ভুল নিজেরই। ফের শুরু করতে হবে।

আবার তো একই জায়গায় পৌঁছব !

তা কেন ? প্রথমবার কোথায় ভুল করেছিলি, সেটা দেখবি না ? রাতে শুয়ে শুয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সমস্যাগুলো এক-দুই-তিন করে ফেলে দেখবি, ঘটনার মধ্যেই সমস্যার মূল সূত্র লুকিয়ে আছে। অবশ্যম্ভাবী বিষয়। হতেই

হবে! তুই বুদ্ধিমান ছেলে, তুই সেটা পারবিই! প্রত্যেকটা মানুষই, সে যদি ভাবে, আমি এই কাজটা অবশ্যই করব, তবে তা সে পারবেই! শতকরা একটা কি দুটো মিস হতে পারে, যা গোনার মধ্যেই আসে না।

বদ্রীনারায়ণ খেতে খেতে কেদারদার কথা শুনছিল। কেদারদার কথায় কনফিডেন্স পাওয়া যায়। সত্যিই! কেদারদা যে সব বিষয়ে হাত দিয়েছেন, সবগুলোতেই সাকসেস হয়েছেন। হয়তো সব কাজ নিজে পারেননি, অন্য লোকের সাহায্য নিতে হয়েছে অনেকটাই।

তুই বোধহয় ভাবছিস, হঠাৎ করে কারও সাহায্য পেয়ে যাওয়ার কথা! তাই না!

তুমি কি করে বোঝ বলতো? আমি কী ভাবছি!

` এতে কোন ম্যাজিক নেই। তোর জায়গায় আমি থাকলে যা ভাবতাম, সেটা চিন্তা করলাম। ব্যস!

হুঁ। ঠিকই বলেছ।

তবে কী জানিস! তোকে অসম্ভব ডায়নামিক হতে হবে। অসম্ভব বুদ্ধিমান এবং যতটা সম্ভব সাহসী।

কেন? যতটা সম্ভব সাহসী কেন? অসম্ভব সাহসী নয় কেন?

অসম্ভব সাহস দেখিয়ে তুই একাই যদি জলদাপাড়ায় বনের ভেতর দাঁতাল হাতির মুখোমুখি হোস, আর বেঘোরে প্রাণটা দিস, তবে তাকে হঠকারিতাই বলব। বলব সাহসের অপচয়। কেদার কথাগুলো যেন একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে বললেন।

এবার বদ্রীনারায়ণ সরাসরি তাকাল কেদারের দিকে। দু-জনের চোখাচোখি হল। দু-জনের চাহনিতেই বেশ তীব্রতা ছিল। কেদারের চোখদুটো বড় বড়। তার মধ্যে আছে পরিণত বুদ্ধি আর বাস্তববোধের ছাপ। সে চোখ যেন কথা বলে। একটা মানুষকে আগাপাশতলা বুঝে নিতে পারে। ওই চোখ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী। ওই চোখ অনেক কাজ করবে বলেই মনে হয়। বদ্রীনারায়ণ শিউরে উঠল। কেদার বদ্রীনারায়ণের ভাসা ভাসা বিড়াল চোখের দিকে তাকিয়ে চিন্তার জালটাকে ছুঁড়ে দিলেন অনেক দূরে। বহু দূরে! কেদার ভাবছিলেন, বদ্রী যেন ঠিক পৃথিবীর মানুষ নয়। ও যেন গ্রহান্তরের জীব। ওর ওই নীল চোখ দুটোয় স্বপ্ন খেলা করে। ঠিক বাস্তব নয়। ওই চোখ দুটো ভবিষ্যৎকে দেখতে পায়। অতীতকে ছুঁয়ে ফেলে। বদ্রীনারায়ণ ভাবছিল, কেদারদার সাঙ্ঘাতিক কনফিডেন্স। শুধু দৈহিক শক্তি নয়, মানসিক শক্তিতেও কেদারদা শক্তিমান।

বাবু চা!

ওরা দুজনেই সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘণ্টা চা নিয়ে হাজির। কেদার গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে বদ্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, বদ্রী, তোর চোখে আগুন জ্বলছে। অদ্ভুত রহস্যময় নীল আগুন! আমি সেটা বুঝতে পারি। তুই পারবি! তোকে আমি তৈরি করে দেবো!

কেদারদার চোখে চোখ রেখে বদ্রী যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। ওর নীল চোখের ভেতর মণিদুটোর রঙটাই যেন পালটে যেতে লাগল। ঘুরতে লাগল সাতটা রঙ। অদ্ভুত কাঁপুনি সারা শরীরে। ওর মস্তিষ্কের কোষে কোষে অজস্র ছবির প্রজেকশন চলতে লাগল। কেদার বুঝলেন, বদ্রীর মনের মধ্যে কিছু একটা ঘটে চলেছে। সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলো ছুটছে। সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোক। এ কোথায় চলেছে বদ্রী ? সে কি ওর নিজস্ব ঠিকানায়!

তক্ষুণি ভেতরের ঘরে ক্র্যাং ক্র্যাং শব্দে টেলিফোন বাজল। বদ্রী বাস্তবে ফিরে এল। কেদার উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো!

এটা কি উদিতভানু ইনফরমেশন ?

হ্যাঁ।

কেদার মজুমদার আছেন ?

কথা বলছি। আপনি ?

আমাকে চিনবেন না। আমি একটু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একটা বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছি।

আজ বিকেলেই চলে আসুন। ঠিকানাটা বলে দিচ্ছি।

ঠিকানা জানা আছে। আমি আগেই খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম।

আপনার নামটা কী ?

রথীন্দ্রমোহন সেন। তাহলে আজ বিকেলেই আমি আপনার কাছে যাচ্ছি।

ও কে! টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কেদার দেখলেন বদ্রীও ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে।

বুঝলি বদ্রী!

বলুন।

রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

নতুন কেস ?

হুঁ। বিকেলে এক ভদ্রলোক আসছেন। থাকিস। কথাবার্তাগুলো যতটা সম্ভব সতর্কভাবে বুঝে নিবি।

বদ্রী কেদারদার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কেদার দেখলেন, বদ্রীর চোখে সেই রঙের খেলা। মেয়েলি চোখ দুটোয় একেবারে ভিন্ন গ্রহের ছোঁয়া। বাইরে টুং-টাং শব্দ। ঘণ্টা এসে গেছে। গোপালের চায়ের দোকানের বয়। কাপ-প্লেট-চামচ তুলছে টেবিল থেকে। কেদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কত হল রে তোর?

দু-পিস টোস্ট আড়াই ট্যাকা। দুটো ডবল ডিমের পোঁচ আট ট্যাকা। দুটো লেবু চা দু ট্যাকা। মোট সাড়ে বারো ট্যাকা।

এই নে! একটা কুড়ি টাকার নোট দিয়ে কেদার বললেন, আট আনা তুই রেখে সাত টাকা ফেরত দিয়ে যাবি।

রথীনবাবু যখন 'উদিতভানু'তে এলেন তখন বিকেল পৌনে পাঁচটা। কেদার তখন ক্যারাটে শেখাচ্ছিলেন ছাত্রদের। কেদারের পরনে ছিল ক্যারাটে মাস্টারের ঢিলে-ঢালা পোশাক। বদ্রীনারায়ণ ঘরে বসে ভাসিলি ইয়ানের লেখা 'চেঙ্গিজ খান' উপন্যাসটা পড়ছিল। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি থেকে বদ্রীই বইটা এনেছে। এ মাসেই কেদার ওকে রিডিং লাইব্রেরির মেম্বার করে দিয়েছেন। শিয়ালদার মেসটাও ও ছেড়ে দিয়েছে। বদ্রী এখন 'উদিতভানু'তেই আছে কেদারদার সঙ্গে। বদ্রী রথীনবাবুকে বসিয়ে গোপালের চায়ের দোকানে চা-বিস্কুট বলে এল। কেদারও ততক্ষণে ক্যারাটে গ্রাউণ্ড ছেড়ে উঠে এসেছেন। রথীনবাবুর কাছাকাছি চেয়ারটা টেনে কেদার বসলেন।

বলুন। আমিই কেদার মজুমদার। ও হচ্ছে বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি। আমার সঙ্গেই কাজ করছে।

হ্যাঁ, শুনেছি নামটা। আপনাদের কথা জানলাম বেলগেছিয়ার সত্যকাম ব্যানার্জির কাছে। ও তো আপনার পরিচিত! তাই না!

ও হ্যাঁ। ওতো আমার অনেকদিনের চেনা। কদিন আগে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম ছোট্ট একটা কেস সামলাতে।

হ্যাঁ, ঘটনাটা শুনেছি। ওরা তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

ওই আর কি! এবার আপনার কথা শোনা যাক। বদ্রী! কোথায় গেলি! এই ছিল। এর মধ্যেই হাওয়া!

বদ্রীও ততক্ষণে আবার হাজির।

আমার নাম রথীন্দ্রমোহন সেন। ফোনেই বলেছি। আমি থাকি পুরুলিয়া শহরে। আজ থেকে দু-বছর আগে আমার দিদি বকুলরানি দত্ত এক দুর্যোগের রাতে নিখোঁজ হয়ে যায়।

কোত্থেকে নিখোঁজ হন?

ওই জেলারই বান্দোয়ান থেকে।

সেখানে কি ওনার শ্বশুরবাড়ি?

ঠিক শ্বশুরবাড়ি নয়। আমার বাবা বান্দোয়ানে একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি করেছিলেন। সেটি বিয়ের সময় দিদির নামেই লিখে দেওয়া হয়। 'সেন ভিলা' নাম পালটে 'বকুল নীড়' নাম রাখা হয়।

আপনার বাবা কী করতেন?

ঘাটশিলায় ব্যবসা ছিল।

এখন?

ঘাটশিলার পাট চুকিয়ে দিয়ে আমি পৈতৃক ব্যবসা আস্তে আস্তে পুরুলিয়ায় শিফ্‌ট করে নিয়েছি।

আপনার দিদির হাজব্যান্ড কী করেন?

দিদির হাজব্যান্ডের নাম মনোরঞ্জন দত্ত। সে তামাকের বিজনেস করে।

দিদির সঙ্গে সম্পর্ক কী রকম ছিল?

খুব ভালো নয়। দিদির ছেলেপুলে হয়নি। তাই থেকেই অশান্তি। দিদি বান্দোয়ানে থাকতেন। পয়সাকড়ির অভাব ছিল না। আমি তিন মাসে, ছ-মাসে যেতাম-টেতাম।

আপনার দিদির হাজব্যান্ড তা হলে কোথায় থাকতেন?

সে পুরুলিয়ায় থেকেই বিজনেস করত।

হঠাৎ দু-বছর বাদেই বা আপনি কেন দিদির খোঁজ করছেন?

শেষের দিকে দিদির মধ্যে একটা পাগলামি ভাব এসেছিল। আমি ভেবেছিলাম, কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়েছেন, একদিন খুঁজে পাবই। পুলিসকে দিয়ে প্রচুর খোঁজ করিয়েছি। মনোরঞ্জনবাবুও করেছেন।

তাহলে!

গত মাসে আমি বান্দোয়ান গিয়েছিলাম। দেখলাম 'বকুল নীড়' ভেঙে বিরাট বাড়ি উঠছে। বড় রাস্তার পাশে বাড়ি। জায়গার দামও অনেক। নিচের তলায় প্রচুর দোকান করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। একেবারে মিনি মার্কেট হয়ে গেছে।

আপনার দিদি মারা যাবার পরে বকুল নীড়ের আইনি মালিক হন মনোরঞ্জনবাবুই তো?

হ্যাঁ।

এখনও কি উনিই মালিক?

না। উনি বলছেন, পঞ্চাশ হাজার টাকায় ওই বাড়ি বেচে দিয়ে বান্দোয়ানের পাট চুকিয়ে ফেলেছেন।

বকুল নীড়ের বাজার-দর কত হওয়া উচিত ছিল?

লাখ পাঁচেক টাকা। লাগোয়া জমি আছে বিঘে দেড়েক। শুধু তাই নয়, আমি এসেছি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে বলে।

কী ঘটেছে?

আমি বান্দোয়ান গিয়েছিলাম সেদিন সকাল দশটা নাগাদ। সেখানে একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করি। সেখানে দেখি, আমার দিদির কাছে যে বউটা কাজ করত, সে হোটেলে কাজ করছে। সে আমাকে দেখে বেশ ভয় পেল মনে হল। আমি তবু ওকে ডাকলাম। কেমন আছে জিজ্ঞেসও করলাম। ও আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, 'বাবু! ইখান থিক্যে পাইল্যে যান। নাইল্যে বকুলদিদির মত্যো খুন হইয়ে যাব্যেন।'

তারপর?

এ কথা বলে বউটি দাঁড়ালই না। তাড়াতাড়ি করে চলে গেল। আমি সে রাতটা ওখানে একজন পরিচিত লোকের বাড়িতেই কাটালাম। পরদিন সকালে পুরুলিয়া ফিরে আসবার জন্য বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি, দেখি রাস্তায় খুব ভিড়। কছে গেলাম। ওখানে রাস্তার একপাশে গভীর খাদ। লোকজন সবাই সেখানে উঁকি দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। সেই বউটি বীভৎসভাবে মরে পড়ে আছে কাঁটা ঝোপের ওপর। জিভটা বেরিয়ে আছে। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। পরনে ছিল গতদিনেরই শাড়িটা। আমি আর সেখানে দাঁড়াইনি। বাস ধরে সোজা পুরুলিয়ায় চলে আসি। এ সপ্তাহেই কলকাতায় এসেছি। দিদির নিখোঁজ হওয়া নিয়ে প্রথমে আমি এ রকম কিছু ভাবিনি। এখন ভাবছি। আপনাকে এই কাজটার ভার নিতে অনুরোধ করছি।

ঘটনাটা মনোরঞ্জনবাবুকে জানিয়েছেন?

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে কথা বলেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

আপনার কি মনে হয়, ওই মহিলাটি খুনই হয়েছে? দুর্ঘটনাও তো হতে পারে!

আমার মন বলছে ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম। বীভৎসভাবে পড়েছিল মহিলাটি। ওফ্!

ঘুমোতে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মৃতদেহটা। রোজ। বোধহয় আমারই জন্য খুন হল সে।

আপনি বিয়ে করেছেন?

না। বাবা মারা যাবার পর আপনজন বলতে ওই দিদিই ছিল।

ঠিক আছে। আপনার দিদির হারিয়ে যাবার রহস্য সমাধানের কাজটা নিলাম।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি আগাম কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি। পুরুলিয়া অথবা বান্দোয়ান যেখানেই যান না কেন, থাকার ব্যবস্থা আমি করব—এই বলে রথীনবাবু উঠে পড়লেন। বদ্রী দেখল, রথীন সেনের গমন পথের দিকে তাকিয়ে কেদার কী যেন ভাবছেন।

রহস্যের জটিল ঘূর্ণি

আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার হাওড়া থেকে ছাড়ল রাত সাড়ে নটা নাগাদ। ট্রেন যখন পুরুলিয়া পৌঁছল তখন সকাল। আকাশ মেঘলা ছিল। আবহাওয়াটা বদ্রীর বেশ ভাল লাগছিল। সারা রাত ট্রেন জার্নির পরও ক্লান্ত লাগছিল না। স্টেশনের বাইরে পা দিয়েই বদ্রী রথীনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, পুরুলিয়া নাকি খুব রুক্ষ জায়গা? কিন্তু তেমন তো লাগছে না!

শহরের বাইরে পা দিলেই সেটা বোঝা যাবে। রথীনবাবু উত্তর দিলেন।

এবার কেদার বললেন, বুঝলি বদ্রী, দু-একদিন থাকলেই পুরুলিয়া জেলার বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবি। দক্ষিণবঙ্গের সমতলভূমি থেকে এখানকার মাটির বৈশিষ্ট্যই আলাদা।

কেমন?

ধর, বর্ধমান, হাওড়া হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ হচ্ছে একেবারেই যাকে বলে গঙ্গাবিধৌত সমভূমি। ফসল ভাল হয়। ধান, পাট, রবিশস্যের অঢেল ফলন। এখানে ধানের যথেচ্ছ ফলন ভাবাই যায় না। এই জন্য পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুরুলিয়া আর বাঁকুড়া হল পিছিয়ে পড়া গরিব জেলা।

রথীনবাবু ততক্ষণে একটা রিকশা নিয়ে নিয়েছেন।

চল রাঁচি রোড। সার্কিট হাউসের একটু আগে। কত নেবে?

পাঁচ টাকা।

রিকশা চলল। বদ্রী রাস্তার দু-ধার দেখছিল। জমজমাট শহর। এত সকালেই

প্রচুর রিকশা চলছে সওয়ারী নিয়ে। ট্রেনের যাত্রীও রয়েছে অবশ্য। তিন-চারতলা বাড়ি রয়েছে রাস্তার দু-পাশেই। অজস্র। অবশ্য দোতলা বাড়ির সংখ্যাই বেশি। সদর থানা, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, সদর হাসপাতাল, বাস টার্মিনাস পেরিয়ে রাস্তা ত্রিধা বিভক্ত। রিকশা ডাইনের রাস্তায় ঢুকল। রাঁচি রোড। শহরে কোলাহল কমে এসেছে। ছোট শহরের প্রান্তরেখা। রথীনবাবু রিকশা দাঁড় করালেন। তখন সূর্য উঠে গেছে। পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে তিনজনের লম্বা ছায়া সোজা চলে গেছে ডানদিকে একটা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ির দিকে। রথীনবাবু সেই বাড়িটার দিকেই হাঁটতে শুরু করলেন। গেট খুলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, এটাই আমার পৈতৃক বাড়ি। বদ্রীনারায়ণ গেট পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই অজানা এক বিপদের আশঙ্কায় ওর গা ছমছম করে উঠল। ওর অবচেতন মন নাড়া খেল। কেদারও খেয়াল করলেন না, বদ্রীর নীল চোখে সাত রঙের বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর অনুভূতিগুলোর যেন ঘুম ভেঙে গেল। ওর নার্ভগুলোর সতর্কতা অনেকদূর পৌঁছে গেল। যেখানে সময়ও আপেক্ষিক। সেই বহুদূরে বদ্রী শুনতে পেল বেশ কয়েকজন লোকের নিঃশব্দ পায়ের চলাফেরার আওয়াজ। রথীনবাবু ততক্ষণে বাড়ির তালা খুলে ওদের বললেন, আসুন!

একতলা দোতলা মিলে আটখানা ঘর। একতলায় টানা বারান্দা। বাড়ির পেছনে বাগান। দোতলায় ব্যালকনি আছে। রথীনবাবু দোতলায় দু-খানা ঘর ওদের জন্য খুলে দিলেন। দুই ঘরে আসা-যাওয়ার জন্য ভেতরেও দরজা আছে। রথীনবাবু বললেন, আপনারা বিশ্রাম নিন। আমি আপনাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি। আমার তো ফ্যামিলি নেই! আমার দারোয়ান কাম মালী হচ্ছে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ সোরেন। দরকারে ওকে ডাকবেন। আর রান্নাবান্না করার জন্য আছে দীনুদা। দীনু নায়েক। আমি যখন ছোট, তখন থেকেই দীনুদা আমাদের বাড়িতে। ও ঘাটশিলাতেই ছিল। গত ছ-সাত বছর থেকে ও পুরুলিয়ায় আছে।

আমরা তাহলে চানটা সেরেই নিই। কী বলেন? কেননা, একটু রেস্ট নিয়েই কাজ শুরু করে দিতে হবে—কেদার বললেন।

ঠিক আছে। ওই নিচে টিউবওয়েল, বাথরুম। আমি লক্ষ্মণকে বলে দিচ্ছি সব অ্যারেঞ্জ করে দিতে—এই বলে রথীনবাবু নেমে গেলেন। কেদার এবার বদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেন—

এবার বল তো, রথীনবাবুকে তোর কেমন মনে হচ্ছে?

রথীনবাবু মানুষটা মোটের ওপর ভালই। যদিও একটু অস্বাভাবিক আচরণ আছে।

সে তো এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগে সবার মধ্যেই কমবেশি অস্বাভাবিকতা আছে। এমনিতে রথীনবাবুর কথাবার্তার মধ্যে কোনও ফাঁক ফোঁকর পাসনিতো!

না। কিন্তু রথীনবাবুর এই বাড়িতে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। বদ্রী চোখ বুজে একটু চিন্তা করল। তারপর খুব আস্তে করে বলল, কয়েকজনের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। বহু দূরে! এই বাড়ির দিকেই আসছে। কেদারদা। একটু সাবধান!

তোর আর কিছু মনে হচ্ছে?

মনে হচ্ছে পরিস্থিতি বেশ জটিল।

হুঁ—বলে কেদার চুপচাপ বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বাইরে কার পায়ের শব্দ! ওরা দু-জনেই দরজার দিকে তাকাল। এক বৃদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ট্রে-তে ধুমায়িত গরম চায়ের কাপ, আর সিঙাড়া। সে ফ্যাসফেসে গলায় বলল—

এজ্ঞে আমি দীনু। এই আপনাদের জলখাবার।

ও, তুমিই দীনু নায়েক। এসো, এসো। ভেতরে এসো। আচ্ছা দীনুদা, এই বাড়িতে তুমি ক-বছর হল আছ?

এজ্ঞে ছ-বছর।

তুমি কখনও ভূত দেখেছ?

না।

রাতে কারুর পায়ের শব্দ শুনেছ?

এজ্ঞে না।

তাহলে বাড়িতে কোন ভূত নেই বলছ?

এজ্ঞে না। এ খুব ভাল বাড়ি। তবে বান্দোয়ানে বকুলদিদির বাড়িতে ভূত দেখেছি।

নিজের চোখে দেখেছ?

হুঁ।

কখন?

রাতে।

কেমন দেখেছ?

রাতে বাড়ির পেছনে হাঁটছে।

বান্দোয়ান যেতে কেন তুমি?

দাদা গেলে আমাকে নিয়ে যেতেন।

আচ্ছা। আজ দুপুরে কি খাওয়াবে আমাদের?

ডাল, মুরগির মাংস, চাটনি।

বাঃ। তা' হলে চান-টান সেরে নিই। কী বল!

হাঁ, হাঁ। তাই করুন বাবু।

ট্রেন থেকে নেমে রথীনবাবুর বাড়িতে আসা অবধি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। রথীনবাবু নিজের গদীতে চলে গেছেন। কেদার আর বদ্রীনারায়ণ স্নান খাওয়া সেরে দুপুরে টানা ঘুমিয়ে নিচ্ছে। কেদার মজুমদারের মত হল, কোন চিন্তাশীল কাজে নামার আগে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিশ্রাম। তারপর একদম পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজে। বদ্রী এরই ফাঁকে ঘুম থেকে উঠে 'চেঙ্গিজ খান' উপন্যাসটা পড়ছিল। শেষ হয়নি এখনো বইটা। জমাটি বই। দারুণ পরিশ্রমী গবেষণা করে বইটা লিখেছেন ইয়ান ভাসিলি। কেদারদা বলছিলেন ঠিকই, আমাদের দেশের লেখকরা এর দশভাগ পরিশ্রম করেও

একটা অথেন্‌টিক উপন্যাস লেখেন না। বিকেলে রথীনবাবু এলে কেদার বললেন, তাহলে চলুন, মনোরঞ্জন দত্তের সঙ্গে কথা বলা যাক। সময় নষ্ট করে কী হবে!

মনোরঞ্জন দত্তের বিরাট তামাকের ব্যবসা। বিশাল গদীঘর। গদীর সামনে দু-তিনটে লরি দাঁড়িয়ে আছে। কেদার-বদ্রীকে নিয়ে রথীনবাবু যখন দত্ত ট্রেডার্সে পৌঁছলেন, তখন চারটে বাজে। খুব খাতির করলেন মনোরঞ্জনবাবু। বললেন, হ্যাঁ। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনা ছিল না। এ কথা সত্যি। কিন্তু তার ক্ষতি হোক, তা আমি কখনো চাই না। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। সারাদিনই টেনশনে থাকি। আর এখন যা যুগ পড়েছে, শান্তিমতো ব্যবসা করা কঠিন। একটার পর একটা ঝামেলা লেগেই আছে। তাই দাম্পত্য কলহে জড়াতে চাইনি। সরে এসেছিলাম। ওর চলবার মতো সাফিসিয়েন্ট টাকাপয়সা আমি পাঠাতাম।

আপনারা আলাদা থাকছেন কত বছর হল?

দশ-বারো বছর তো হলই।

আগে বকুলদেবী কোথায় থাকতেন?

পুরুলিয়াতে। আমাদের বাড়িতেই। বান্দোয়ানেও আমার বিজনেস আছে। মাসে একবার তো বান্দোয়ান যেতামই। দু-একদিন ওই বাড়িতে থেকে আসতাম।

কেদার আর বদ্রীনারায়ণকে দত্ত ট্রেডার্সে পৌঁছে দিয়েই চলে গিয়েছিলেন রথীন সেন। বদ্রী ওদের কথার ফাঁকেই মনোরঞ্জনবাবুকে ওয়াচ করে নিচ্ছিল। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর বয়স হবে মনোরঞ্জনবাবুর। কপালের ওপর সামনের দিকের চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। খুব ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষ। চোখ-মুখ দেখে বা কথা বলে ওনার মনের কথা বোঝা খুব শক্ত। তবে বদ্রী ওদের কথোপকথন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। মনোরঞ্জনবাবু উত্তর দিচ্ছিলেন খুব সহজভাবে। প্রশ্নের উত্তরে কোন দ্বিধা ছিল না। উনি কেদারকে জোর দিয়েই বললেন, বকুলের খোঁজ এনে দিন। যে করেই হোক। আমি আপনাকে সবরকম সাহায্য করব। শত হলেও সে আমার স্ত্রী। ধর্মত এবং আইনত। সে হারিয়ে গেল, তার আর খোঁজ পাওয়া গেল না, এটা আমারই ত্রুটি। আমারই অপরাধ। রথীনকে আমি বলেছি, যে করেই হোক, ওকে খুঁজে বের কর। প্রাইভেট গোয়েন্দার সাহায্য নিতে হলে তাই নাও। দু-বছর হয়ে গেল, পুলিস কিছুই করতে পারল না। বদ্রী লক্ষ করছিল, মনোরঞ্জনবাবু পরিষ্কার করে কথা বলেন। কথায় প্যাঁচ নেই। এরই ফাঁকে ব্যবসার কাজও সেরে নিচ্ছিলেন।

কোন ফাঁকে খাবার কিনতে লোক পাঠিয়েছিলেন বদ্রীও খেয়াল করেনি। রসগোল্লা, চমচম, কালাকাঁদ আর সিঙাড়া হাজির। পেটপুরে খাইয়ে দিলেন মনোরঞ্জনবাবু। বদ্রী জানে কেদারদা ভারি পেটুক। ওই তাগড়াই চেহারায় এ সব খাবার একেবারে নস্যি। আরে করেছেন কী! এত খাবার কী হবে—বলে কেদারদা মোটামুটি সবই সাবাড় করে দিলেন। বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি মনে মনে বেশ খানিকক্ষণ হেসে নিল। তবুও এখানে একটি লোকের সন্দেহজনক চাহনি ও এরই মধ্যে লক্ষ করেছে। হ্যাঁ। ওর চোখ এড়ায়নি!

কেদার মজুমদার বদ্রীকে নিয়ে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ দত্ত ট্রেডার্স থেকে বেরোলেন। সন্ধ্যেটা ওরা দু-জনে শহরের যত্রতত্র হেঁটে বেড়ালো। ছোট্ট শহর। পথ হারাবার দুর্ভাবনা কম। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ওরা মেন রোডে গিয়ে পড়ল। একটু এগিয়েই পুরুলিয়া সদর থানা। কেদার বদ্রীকে নিয়ে হঠাৎই থানায় ঢুকে পড়লেন।

বড়বাবু আছেন না কি?

হ্যাঁ। আপনি?

আমার নাম কেদার মজুমদার। বললেই উনি বুঝতে পারবেন। একজন কনস্টেবল ভেতরে ঢুকে গেল। খানিকবাদে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন। কেদার বদ্রীকে লক্ষ করে বলল, তুই একটু বোস! দশ-পনের মিনিট লাগবে—বলে কেদার ভেতরে ঢুকল। বদ্রী এখানকার লোকজনের কথ্যভাষার ধরনটা লক্ষ করছিল। 'যাচ্ছে' বা 'খাচ্ছে'-কে এরা বলছে 'যাইঞছে' বা 'খাইঞছে'! ব-এ শূন্য 'র'-এর উচ্চারণ এখানে ড-এ শূন্য 'ড়' হয়ে যাচ্ছে। মিনিট পনের বাদেই কেদার বেরিযে এলেন। সঙ্গে বড়বাবুও।

এই যে! ওর নাম বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি। ইন্টেলিজেন্ট ছেলেই শুধু নয়, যথেষ্ট অনুসন্ধানী। আমার ফিফ্‌টি পার্সেন্ট কাজ ও-ই এগিয়ে রাখে। বদ্রী ছাড়া আমার এক পা-ও এগনো অসম্ভব।

বড়বাবু বদ্রীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, দেখা যাক, এই ব্যাপারটা সল্‌ভ হতে ক-দিন লাগে।

থানার সামনে থেকে রিকশা ধরে ওরা যখন রাঁচি রোডে রথীনবাবুর বাড়িতে পৌঁছল, তখন সাড়ে আটটা বাজে। রথীনবাবুর বাড়ি থেকে পুরুলিয়া সার্কিট হাউসটা দেখা যায়। সাজানো-গোছানো সার্কিট হাউস বিদ্যুতের আলোর নিচে তার গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাতে মাংস রুটি করেছিল দীনুদা। খেয়ে-দেয়ে ওরা যখন ঘরে ঢুকল, তখন রাত দশটা।

সদর শহরের প্রান্তসীমা রাঁচি রোডের এই জায়গাটাকে গ্রাস করে নিচ্ছিল

রাতের নিস্তব্ধতা। দোতলা থেকে সার্কিট হাউসের আলো, আরও একটু এগিয়ে যুব আবাসের গেটে নিয়নের হলুদ উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছিল। রাস্তার দু-পাশে বড় বড় গাছগুলো দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাত বাড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আলো-আঁধারির রহস্যময়তাও বাড়ছিল। দু-জনের দুটো ঘর থাকলেও কেদার-বদ্রী জুটি একখানা ঘরে বসে কাজ করছিল। একখানা ঘরের চৌকিতে ভাল করে বিছানা পেতে বালিশ পাশ-বালিশ সাজিয়ে রাখলেও ওরা দু-জনে তদন্তের এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিল পাশের ঘরটায় বসে। এটা ওদের একটা কমন টেকনিক!

বুঝলি বদ্রী, ব্যাপারটা বেশ জটিল। যত সহজ ভেবেছিলাম, তত সহজ নয়।

কেন?

থানার বড়বাবু বলল, রথীন সেন আর মনোরঞ্জন দত্তের মধ্যে কিছুদিন আগেও সম্পর্ক ছিল আদায়-কাঁচকলায়। দু-জনের অ্যাডজাস্ট হল কিসের ভিত্তিতে সেটা রহস্যজনক।

তবে মনোরঞ্জন দত্ত বেশ পরিষ্কার কথার মানুষই মনে হল। প্যাঁচ-ঘোঁচ নেই।

ধরলাম তাই-ই হল। তবুও উনি কিছু কথা চেপে গেছেন। প্রথমত, বকুলরানির অবর্তমানে বকুলনীড়ের আইনি মালিক হওয়া উচিত মনোরঞ্জনবাবুরই, এও যেমন সত্যি, তেমনই বকুলরানি একটা উইল করে বকুলনীড় এবং লাগোয়া জমিটুকু রথীনবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল এটাও সত্যি।

এ কথা নিশ্চয়ই থানার বড়বাবু বলেছে!

ঠিকই ধরেছিস। ঘটনাটা যদি তাই হয়, ওই সম্পত্তির কারণেই বকুলরানি গুম হয়েছে কিংবা খুন হয়েছে।

পুলিস উইলের কথা জানল কী করে?

পুরুলিয়া কোর্টের উকিল গৌরাঙ্গ মুখার্জিকে দিয়ে বকুলরানি ওই উইলটা করান। কিন্তু বকুলরানি নিখোঁজ হবার তিনদিন আগে উইলটা উনি গৌরাঙ্গবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে উইলটা আর বকুলনীড়ে পাওয়া যায়নি। গৌরাঙ্গবাবু বিষয়টা পুলিসকে জানালে পুলিস তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও উইলটা পায়নি।

তাহলে এখানে অপরাধী কে? রথীনবাবু? না মনোরঞ্জনবাবু? এঁরা মহিলাকে গুম-খুন করে আবার গোয়েন্দা লাগিয়ে তদন্ত করাবে, এক্কেবারে অ্যাবসার্ড!

ঠিকই। আমরা স্পটে না যাওয়া পর্যন্ত সঠিক ধারণাও করতে পারব না। তবে অপরাধ বিজ্ঞান বলে, খুনী তার অতিরিক্ত কনফিডেন্স থেকে কখনও কখনও পুলিস বা গোয়েন্দাদের জালে ইচ্ছে করেই মাথা গলিয়ে দেয়। কথা বলতে বলতে কেদার তাঁর পাঁচ ব্যাটারির টর্চটায় ব্যাটারি ভরে নিচ্ছিলেন।

রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছিল। নিচের ঘরে দারোয়ান লক্ষ্মণ সোরেন সবে শুয়েছে। দীনু নায়েকও খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে থালাবাসন মেজে শুয়ে পড়েছে। সবে তন্দ্রা এসেছে। ঘুম গাঢ় হয়নি। বাইরে রোড লাইটের আলো রাস্তাকে পুরো আলোকিত করতে পারেনি। শহরের পথঘাটে লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। রথীনবাবু একতলার ঘরে কাজকর্ম শেষ করে দোতলায় শোবার ঘরে বিছানায় বসেছিলেন। কিছু একটা দুর্ভাবনায় তাঁর কপালে বারেবারেই ভাঁজ পড়ছিল। ঘরে সব আলো নেভানো। শুধু পনের ওয়াটের টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে। টেবিলে পড়ে রয়েছে একগাদা দলিল-দস্তাবেজ আর জাবদা খাতা। সার্কিট হাউসের নিয়নের তীব্র হলুদ আলো রথীনবাবুর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে তির্যকভাবে মেঝেতে পড়েছে। সেই আলো ত্রিভুজাকারে ছুঁয়ে গেছে খাটের একটা কোণা। ঝিঁ ঝিঁ-র লাগামহীন ডাক শোনা যাচ্ছিল। সামনের বটগাছটার ডাল থেকে কোন এক রাতপাখি উড়ে গেল। ডানার ঝটপটানি আর ডালপালার নড়াচড়ায় রাতের নীরবতা খানিক ব্যাহত হল। কি মনে করে রথীনবাবু খাটে বসলেন। দাঁড়ালেন। টেবিলের কাছে গিয়ে দলিল-দস্তাবেজগুলো ওলটালেন। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ঘরের শিকল তুলে দিলেন। এবার পা টিপে টিপে দোতলায় যেখানে কেদারবাবু আর বদ্রীনারায়ণ আছে, সেদিকে চললেন। টেবিলল্যাম্পটা জ্বলতে থাকল।

সেই সময় সদর থানা থেকে পাঁচজন লাঠিধারী কনস্টেবল সশব্দে রাঁচি রোডের দিকে রওনা দিল। তারা বেশ জোরেই নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। দীনু নায়েক তন্দ্রাচ্ছন্ন। সে ভাবছিল, বাবুরা ভূতের কথা জিজ্ঞেস করল কেন ? এবাড়িতে ভূত-টুত নেই। গত পাঁচ-ছ-বছরে ভয়ের কিছুই সে দেখেনি। বান্দোয়ানে বকুলদিদির বাড়িতে গেলেই ওর বরং ভয় লাগত। ও দেখেছে, রাতে বাড়ির বাগানে চার-পাঁচটা ভূত হাঁটাহাঁটি করছে। দীনু নায়েক আধো তন্দ্রায় পাশ ফিরে শুলো। কানটা মেঝেয় পাতা বিছানায় লাগতেই ওর মনে হল, কে যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে। দীনুর তন্দ্রা ছুটে গেল। ভূত! বাবুরা ঠিকই বলেছে। ও ভয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। পায়ের শব্দটা তখন দূরে চলে যাচ্ছে।

গাঢ় রাতে আততায়ীর ছোবল

পুরুলিয়া রেল স্টেশন থেকে হাওড়ামুখী কয়েক পা এগোলেই লেভেল ক্রসিং। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে উচ্চাবচ পাথুরে জমির ওপর দিয়ে হুড়া, কাশীপুর, আদ্রা, বাঁকুড়া হয়ে কলকাতার দিকে। লেভেল ক্রসিং থেকে একটু দূরে রাস্তাটা ধূ-ধূ মাঠে পড়বার আগেই একটা ব্রিজ। বাঁ-পাশে একটা মন্দির। মন্দিরে আলো জ্বলছে। এখান থেকে আলোকিত শহরটা দেখতে সুন্দর লাগে। কিন্তু এখন কেউ সে সৌন্দর্য দেখছে না। দন্ডে-পলে রাত গভীর হচ্ছিল। নিঃস্তব্ধতার এক ধরনের শব্দ থাকে। চরাচর পরিব্যাপ্ত ছিল সেই শব্দে। লোকচক্ষুর আড়ালে অন্ধকার মুড়ি দিয়ে ব্রিজ থেকে খানিক দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর। রাত গড়াতে গড়াতে ঘড়ি একটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই করছে। তখন হঠাৎই অন্ধকার ফুঁড়ে চারজন মানুষের উদয় হল গাড়িটার পাশে। ওরা দ্রুত গাড়ির চারটে দরজা খুলে গাড়িতে বসে পড়ল। একজন সামনে, একজন স্টিয়ারিংয়ে, দু-জন পেছনে। পাঁচ থেকে ছয় সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়ি স্টার্ট! তারপরই ব্রিজ পেরিয়ে প্রচণ্ড গতিতে শহরের দিকে ছুটল গাড়ি। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে রাতের ফাঁকা রাস্তায় যান্ত্রিক গর্জনে জোরে ছুটছে গাড়ি। অস্বাভাবিক দ্রুততায়। বাসস্ট্যান্ড অবধি আসতে আড়াই মিনিট লাগল। একটু স্পিড কমিয়ে রাঁচি রোডে ঢুকেই আবার স্পিড বাড়ল। একেবারে থামল রথীন সেনের হলুদ বাড়ির গেটের সামনে। যান্ত্রিক গর্জন থামল। আবার নিস্তব্ধতা। এক সেকেণ্ড-দু-সেকেণ্ড-তিন সেকেণ্ড—সময় বয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার বাদে বাকি তিনজন দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামল।

তারপরই ওই তিনজন দৌড়ে গিয়ে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল রথীন সেনের বাড়িতে। ওদের পায়ে ছিল রবারের জুতো। তাই কোন আওয়াজ হচ্ছিল না। রথীনবাবুর শোবার ঘরের জানালা খোলাই ছিল। ভেতরে ছিল অস্পষ্ট আলোকাভাস। নিশাচর তিনজন তখন সেই জানালার নিচে। একজন তার পকেট থেকে একটা দড়ির মই বের করে ছুঁড়ে দিলো জানালার গরাদ লক্ষ করে। গরাদে মইয়ের আঁকশি আটকে গেছে। আওয়াজ হল খুট্ করে।

বদ্রী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, ব্যস্ততম শহরে একটা মোটরগাড়ি জোরে ছুটে আসছে। সেটা ওর সামনেই দাঁড়াল। তারপরই হঠাৎ সব কিছু থেমে গেল। অদ্ভুত নীরবতা। যে পায়ের শব্দগুলো আজ সকালে ও বহুদূরে শুনতে পেয়েছিল, সেই নিঃশব্দ চলাও এখন খুব কাছে শুনতে পাচ্ছিল। তারপরই

একটা শব্দ খুট্! বদ্রীর ঘুম ভেঙে গেল। বিপদ! ও চট করে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে চলে গেল। নিচে বাগানে দেখল তিনজন ছায়ামূর্তিকে। ও চকিতে জানালা থেকে খাটের কাছে সরে এসে কেদারকে ডেকে তুলল। কেদারদা! নিচে বাগানে কতগুলো লোক! কেদারের ঘুম খুবই পাতলা। উনি উঠে বসে বালিশের তলা থেকে দ্রুত পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা বদ্রীর হাতে দিয়ে কোল্ট রিভলভারটা ডান হাতে নিয়ে জানালার একপাশে চলে এলেন। সার্কিট হাউসের উজ্জ্বল নিয়নের আলো এসে ধাক্কা খেয়েছে রথীনবাবুর এই হলুদ রঙের বাড়িটার দেওয়ালে। সেই আলোয় দেখা গেল, একটা লোক দড়ির মই বেয়ে রথীনবাবুর জানালা বরাবর উঠছে। লোকটার ডান হাতে কোন একটা অস্ত্র রয়েছে। এখান থেকে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এক্ষুণি কিছু করতে হবে। না হলে রথীনবাবু খুন হয়ে যাবেন। বদ্রী! কুইক! বি রেডি! কেদার জানালা থেকে সরে এলেন। চল, পাশের ঘরে। পাশের ঘরের জানালা বন্ধ। আস্তে ছিটকিনি খুলে কেদার বাইরেটা দেখে নিলেন। আততায়ী রথীনবাবুর ঘরের জানালার কাছে চলে এসেছে। দড়ির মুখটা খুব দুলছে বলে ছায়ামূর্তিটা একটু থেমেছে। বদ্রী! নিচে দড়ির মই ধরে যে দু-জন দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে টর্চ মার। কুইক্! কুইক! পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ঝলসে উঠল বাগানে। নেভা! টর্চ নিভল! কেদার চিৎকার করলেন—

'যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ নড়বে না! নড়লেই গুলি চালাব!'

কিন্তু নিশাচররা দুর্দান্ত সাহসী, বেপরোয়া, ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং অসম্ভব দ্রুতগামী। বদ্রীর অবচেতন মন সেটা বুঝে ফেলেছিল। বদ্রী জানালার পাশ থেকে এক লাফে কেদারের ঘাড়ে পড়ে তাঁকে একেবারে মাটিতে শুইয়ে দিল। ওমনি গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে দুটো গুলি ছুটে এল, যেখানে কেদার দু-সেকেণ্ড আগে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে। গুলির শব্দে এলাকার নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। কেদার মজুমদারের গলার আওয়াজ লক্ষ করে ওরা অব্যর্থ নিশানায় গুলি চালিয়েছে। কেদার শত্রুপক্ষকে তাই সাবাশি দিলেন। এবং দেরি করলেন না। দ্বিতীয় জানালা থেকে দড়ির মই লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। বদ্রী ততক্ষণে বুকে হেঁটে প্রথম ঘরটায় চলে গেছে। আগন্তুকদের হকচকিয়ে দেবার জন্য ও ডানদিকের জানালা দিয়ে টর্চের আলো মেরেই বাঁদিকের জানালায় চলে গেল।

কিন্তু সব চুপচাপ হয়ে গেছে দ্রুত। কেদার জানালার পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, বাগান সুনসান। নিচে কেউ নেই। এমনকি দড়ির মইটাও নেই। বদ্রী তখন ছুট লাগিয়েছে রথীনবাবুর ঘরের দিকে। ঘরের সামনে

গিয়ে ও থমকে গেল। ঘরের শিকল তোলা বাইরে থেকে। বদ্রী শিকলটা খুলে ফেলল। কেদারও তখন দৌড়ে এসেছেন। ঘরে কেউ নেই। ঘর ফাঁকা। ওরা দু-জনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক। বাইরে গেটের সামনে মোটরগাড়ির স্টার্টের শব্দ। কেদারদা দৌড়ে জানালার সামনে গিয়ে মোটরের শব্দ লক্ষ্য করে গুলি চলালেন। নিস্তব্ধতা ভাঙল ফের। কিন্তু হা হতোস্মি। অ্যাম্বাসাডরটা তখন দৌড় লাগিয়েছে। দারুণ গতিতে! ওটা রাঁচি রোড ধরে ছুটে চলল ঝালদার দিকে!

পাঁচজন কনস্টেবল টহল দিতে দিতে চলে গিয়েছিল পুলিস সুপারের বাংলোর দিকে। প্রথম দুটো গুলির আওয়াজে ওরা চমকে গেল। ডাকু-ডাকু বলতে বলতে ওরা মেন রোডে উঠে এল। তারপর আর একটা গুলির আওয়াজ। খানিকক্ষণ পরে আর একটা। এক মিনিটও হয়নি, একটা কালো অ্যাম্বাসাডর ওদের সামনে দিয়ে দুরন্ত গতিতে চলে গেল। ওরা চিৎকার জুড়ে দিল। লাঠিধারী কনস্টেবলগুলো গুলির মুখে যেতে নারাজ, বোঝা গেল। এদিকে দু-চারটে বাড়ির জানালা-দরজা খুলতে শুরু করেছে। দু-একজন বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লাঠিধারী এক কনস্টেবল আর একজনকে বলল—

অ রামকিঙ্কর! সার্কিট হাউজে ঢুঁইক্যে পড়!

ক্যানে?

উখ্যানে টেলিফোন আছ্যে। থানায় ফোন কইরত্যে হব্যে।

বটে বটে! চল্ চল্!

সার্কিট হাউসের নাইটগার্ড তখন গেটের কাছে চলে এসেছে।

বদ্রী মনে মনে বলল, অসম্ভব! রথীনবাবুকে ওরা এটুকু সময়ের মধ্যে কিডন্যাপ করতে পারে না! কেদার মজুমদার তখন দোতলার ঘরগুলো দেখতে ব্যস্ত। দারোয়ান লক্ষ্মণ ওপরে উঠে এসেছে। বদ্রী কী ভেবে নিচে গেল। তারপর হাঁক দিল, রথীনবাবু! আপনি কি নিচে আছেন?

হ্যাঁ! আমি নিচেই আছি। বাইরে। লোকগুলোর পিছু নিয়েছিলাম।

রথীনবাবু উঠোন থেকে বারান্দায় উঠে এলেন। বদ্রী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। চেঁচিয়ে বলল, কেদারদা! রথীনবাবু নিচে আছেন! তক্ষুণি একটা পুলিসের জিপ বাড়ির গেটের কাছে থামল। বদ্রী দেখল বড়বাবু গেট খুলে ভেতরে ঢুকছেন। সার্কিট হাউস থেকে তখন পাঁচ কনস্টেবল বেরিয়ে এসেছে। ওদের ফোন পেয়েই বড়বাবু জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ততক্ষণে বাড়ির সামনে একজন দু-জন করে গোটা পঞ্চাশেক লোকের ভিড় জমে গেছে। কী হয়েছে?

কী হয়েছে! বলে গুঞ্জনটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল। দু-একজন লোক রথীনবাবুর বাড়িতেও ঢুকে পড়েছে। এবার পাঁচ কনস্টেবল বীরত্ব দেখানোর স্কোপ পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে দু-জন হিন্দুস্থানী। ওরা চিল্লাচ্ছিল, হট্-যাও! হট্-যাও! ইধার মাৎ আনা। একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে দাদা! ডাকাইত পইড়ছ্যে বটে! খুন হঞেছে! হায় হায়! বড় রাস্তার ওপর ডাকাইতি! ডেঞ্জারাস! সবাই উঁকি দিচ্ছে রথীনবাবুর বাড়ির দিকে। হিন্দুস্থানী পুলিসটা লাঠি উঁচিয়ে সবাইকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু লোকজন সেখান থেকে নড়ল না। লোক ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। রাস্তায় এত লোক বেরিয়ে পড়ায় রাত্রির নৈঃশব্দ্যজনিত গুমোট আতঙ্কের ভাবটা কেটে যাচ্ছিল। বলাবলি চলছিল। তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। ডাকাতি না খুন? না পলিটিক্যাল মার্ডার? নাকি মাফিয়া হামলা? এই সব কথাগুলো রাতভর লোকজনের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল।

বদ্রী রথীন সেনকে ভাল করে দেখে নিল। মনে হল উনি একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আছেন। কেদারও তড়িঘড়ি নিচে চলে এলেন। কোথায় গিয়েছিলেন? কেদারদা রথীনবাবুর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। আমি জেগেই ছিলাম, রথীনবাবু বললেন। নানারকম চিন্তায় ঘুম আসছিল না। তখনই দড়ির মইয়ের আঁকশিটা আমার ঘরের জানালায় আটকানো হয়। 'খুট্' করে একটা শব্দ হয়েছিল। আমি নিচে তিনজনকে দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়েছিলাম। ওরা কারা, নিচে নেমে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কেদারবাবু! ওরা কারা আমি জানি না। কিন্তু দারুণ ট্রেনিং ওদের। দড়ির মইটা খুলে নিয়ে ওরা যেভাবে নিঃশব্দে আর এত তাড়াতাড়ি পালালো, ভাবা যায় না! আমি গাড়ির নম্বরটা নেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গাড়ি স্টার্ট করে এমন তাড়াতাড়ি বাঁক নিয়ে ওরা ছুটল যে, ডব্লিউ বি এক্স-এর বেশি পড়তেই পারলাম না।

ডব্লিউ বি এক্স, জিরো টু, টু জিরো। আমি দেখেছি। বদ্রী বলল। কেদার বদ্রীর চোখে চোখ রেখে ওকে সাবাশ জানালেন। মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ জুতোর শব্দে তখন গট্ গট্ করে বারান্দায় চলে এসেছেন বড়বাবু পি কে সান্যাল। কেদার বললেন, আপনি এসে গেছেন! রথীনবাবু তো আর একটু হলে খুনই হয়ে যেতেন। বদ্রী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও খুব ধীরে ধীরে কিন্তু দারুণ আত্মবিশ্বাসে বলল, হ্যাঁ এখন যা যা ঘটল, তা যদি আর দশ সেকেণ্ড পরে ঘটত, তবে রথীনবাবুর লাশটা ওনার দোতলার ঘরে পড়ে থাকত। সাবধান! রথীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেমন করে জানলে? বদ্রী তখনও

আত্মমগ্ন স্বরে উত্তর দিল, এ বাড়িতে ঢুকেই আমি পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। মিস্টার সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা? তা জানি না। বদ্রী বলল। তবে ওরা ভয়ঙ্কর! মানুষ খুন ওদের কাছে কিছুই নয়। ইঁদুরের মতো অনুভূতি ওদের নার্ভে। কেউটের মতো বিষ ওদের অস্ত্রে। বাঘের মতো শক্তি ওদের থাবায়। কেদার বললেন, বদ্রী, ওরা কি আবার আসবে? বদ্রী বলল, না। ওরা আসবে না। তবে ওদের সঙ্গে দেখা হবে। ওর গলার স্বরে আত্মবিশ্বাস। কথাটা শুনে বড়বাবু মিস্টার সান্যাল, কেদার মজুমদার আর রথীন সেন পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালেন। ওদের প্রত্যেকের চোখেমুখে বিস্ময় আর প্রশ্নের ভিড়। বদ্রীনারায়ণ তখনও আত্মমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর মেয়েলি চোখ দুটোয় বিদ্যুৎ খেলা করছিল যেন। আর শরীরটা শিরশির করে কেঁপে উঠছিল।

বাঘের থাবায় ধারালো নখ

পুরুলিয়া শহর এখন পেছনে। প্রাইভেটকারটা ছুটেছে বান্দোয়ানের দিকে। রাতে আর কারুর ঘুম হয়নি। মিস্টার সান্যাল কেদার মজুমদারের সঙ্গে আলোচনা করে সকাল ছ'টার মধ্যেই বান্দোয়ান যাওয়া মনস্থ করলেন। যত কম জানাজানি হয়, তার জন্যই এত তাড়াতাড়ি! থানা থেকে প্রাইভেটকারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। মিস্টার সান্যাল বান্দোয়ান থানায় রেডিওগ্রাম করে মেসেজও পাঠিয়ে দিলেন। গত দশ পনের বছর অগেও বান্দোয়ানকে পুরুলিয়া জেলার 'আন্দামান' বলা হত। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সাঙ্ঘাতিক খারাপ। বর্ষায় এক হাঁটু কাদা ভেঙে গ্রামে গ্রামে যেতে হত। তাই এই শিরোপা। কিন্তু এই রাজ্যে যখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের উন্নতির কাজ শুরু হল, তখন বান্দোয়ানের অবস্থাও পালটাতে শুরু করল। কলকাতা থেকে এখন সরাসরি বাসে বান্দোয়ান যাওয়া যাচ্ছে। বান্দোয়ান গঞ্জ এখন শহরের রূপ নিচ্ছে। সাঁওতাল পল্লীতে পল্লীতে জ্বলছে ইলেকট্রিকের আলো। সেই বান্দোয়ানের দিকে চলেছে সাদা রঙের প্রাইভেটকারটা। গাড়ির ভেতরে আছেন বড়বাবু মিস্টার সান্যাল, কেদার মজুমদার আর বদ্রীনারায়ণ। বদ্রী সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল। শরতের সকাল। ছোটনাগপুরের মালভূমিতে এখনও স্নিগ্ধতা। পুরুলিয়া শহর ছাড়িয়ে কংসাবতীর ব্রিজ পেরোতেই সামনে অসীম দিগন্ত। উচ্চাবচ পাথুরে জমি। বদ্রী দেখছিল। সমতল বাংলার থেকে

এ এক অন্য রূপ। কেদারদা বললেন, দেখছিস বদ্রী! রুক্ষ জমি এখন বোঝা যাচ্ছে?

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। কী ফাইন রাস্তা। একবার নামছে। একবার উঠছে। একেবারে সিনেমার মতো।

হ্যাঁ। এখানে আম কাঁঠালের ছায়াঘেরা গ্রাম পাবি না। এখানে পাবি পাথুরে জমিতে অনেক কষ্টের চাষ। আর আছে পাহাড়ি বনাঞ্চল। গাড়ির ড্রাইভার বলল, এখন ইখানে অনেক জোড়বাঁধ হঁইঞেছে। চাষও হঁইঞেছে সে জল থিক্যে।

জোড়বাঁধ জিনিসটা কী? বদ্রী সান্যালবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

ওই পাহাড়ি ছোট ছোট নদীকে স্বল্প পরিসরে বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পাথুরে জমিতে যে জলটা হারিয়ে যেত, একটা নির্দিষ্ট স্থানে সেটাকে ধরে রেখে সেচের ব্যবস্থা করেছে পঞ্চায়েত।

হাঁ বটে। ড্রাইভার বলল, পঞ্চাৎ থিক্যে হাইবিরিড টমাটোম, বাঁধাকপির চাষ হঁইঞেছে পুরুল্যায়। আগে হতনি সেটা। ভাল ফসল ফইলছ্যে।

গাড়ি ছুটছে। বদ্রী লক্ষ করছিল, রাস্তার পাশে কোথাও কোথাও সমতল জমি আছে অনেকটা জুড়ে। ও জিজ্ঞেস করল, এখানে বুঝি ধান চাষ হয়? শুধু বর্ষাতেই হয়। বড়বাবু বললেন।

গাড়ি টাথনায় এসে রেললাইন ক্রস করল। তারপর চাকলাতোড়, কোবাড়িয়া, হকলাড়া পেরিয়ে সাদপুয়ারায় আসতেই ডানদিকে বহুদূরে দেখা গেল দিগন্ত ছড়ানো পাহাড় আর পাহাড়। বদ্রী আর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারল না। কারণ এর আগে ও কোনদিন পাহাড় দেখেনি।

ওরে বাব্বা! কী বিরাট পাহাড়! আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে। কেদারদা, এর তো শেষ দেখছি না। কী নাম পাহাড়টার?

ওটা অযোধ্যা পাহাড়! পুরুলিয়া জেলার বিখ্যাত পাহাড় এটা। অনেকে বেড়াতে যায় ওখানে। সান্যালবাবু বললেন।

ওটা কোন এলাকার মধ্যে পড়ছে? জিজ্ঞেস করলেন কেদার।

বাঘমুণ্ডি এরিয়ায়। বাঘমুণ্ডি নামেও পাহাড় আছে ওখানে। পাহাড়ে অনেক ছোট ছোট গ্রাম আছে। অযোধ্যা নামেও একটা গ্রাম আছে।

বদ্রী চোখ বড় বড় করে পাহাড় দেখছিল। ড্রাইভার বলল, আমরা শর্টকাটে বাঁদোয়ান যাচ্ছি বটে। সান্যালবাবু বললেন, ঠিকই আছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়, ততই ভাল। বুঝলে বদ্রী, আমরা যদি বলরামপুর হয়ে বরাবাজার

দিয়ে বান্দোয়ান যেতাম, তুমি অযোধ্যা পাহাড়টা আর একটু কাছ থেকে দেখতে পেতে।

আমরা তা হলে কিভাবে যাচ্ছি?

আমরা পুরুলিয়া থেকে স্ট্রেইট বান্দোয়ানের রাস্তাটা ধরেছি। ডানদিকের মেন রাস্তা ধরলে টাইম বেশি লাগত। তবে বলরামপুর শহরটা ছুঁয়ে যেতে পারতাম। শহরের রেল স্টেশনের নাম বরাভূম। ছড়ানো ছেটানো পাহাড়ঘেরা সুন্দর শহর বলরামপুর।

বদ্রীর নজর তখনও আকাশচুম্বি অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে। দূরে দিগন্তরেখায় মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের কোলাকুলি চলছিল। অযোধ্যা রেঞ্জ। বদ্রী ভাবছিল, প্রকৃতির এত সৌন্দর্য! কী বিরাট! কলকাতায় শুধু মানুষের ভিড়। কৃত্রিম সৌন্দর্য আছে সেখানে। কিন্তু মানুষ কি পারবে এ রকম সুন্দরকে গড়ে তুলতে?

কেদার মজুমদার তখন গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। রথীনবাবুকে কে বা কারা খুন করতে চেয়েছিল? তারাই কি বকুলরানিকে হাপিস করল! মনোরঞ্জনবাবু এই ঘটনার সঙ্গে কতটা জড়িত? উনি কি গোয়েন্দা লাগানোর ব্যাপারটা ভাল চোখে নেননি? হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল কেদার মজুমদারের মনে। রথীনবাবু কি এমন কিছু জেনেছেন বকুলরানি সম্পর্কে? যাতে তদন্তের কাজে সুবিধা হবে? যে জন্য রথীনবাবু ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিষয়টার কিনারা করতে? তাই কি রথীনবাবু ওদের টার্গেট? আর একটা বিষয়ও ভাবাচ্ছে কেদারকে। গত রাতের আততায়ীরা দারুন পটু এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। বদ্রী আর রথীনবাবু দু-জনে একই কথা বলছে। বদ্রীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কাল কেদারকে অল্পের জন্য বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাহলে এরা কারা? সাধারণ অপরাধীরা এত পটু এবং সায়েন্টিফিক নয়। কাল রাতের আততায়ীরা নিঃশব্দ ঘূর্ণির মতো এসে জেট গতিতে চলে গেল যেন। চিন্তার ব্যাপার বৈকি!

মসৃণ, উচ্চাবচ, ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি যেন উড়ে চলেছে। প্রচণ্ড গতিতে চলতে চলতে অনেক সময় মানুষ চুপ হয়ে যায়। মনের মধ্যে নানা ভাবনা এসে ভিড় করে। আকাশ-পাতাল চিন্তা। বদ্রীর মনটা কেন জানি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। ওর অবচেতন মনের তন্ত্রীতে কি একটা আশঙ্কা বারেবারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। বদ্রী ঠিকমত ধরতে পারছিল না সেটা। তাই বুকের ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছিল ওর। কেদার মজুমদারও তখন গভীর চিন্তামগ্ন! কিভাবে এই জাল গোটাবেন! মিস্টার সান্যাল ভাবছিলেন, কেসটা বহুদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। কোন কিনারা করা গেল না। গত রাতে রথীনবাবু একটুর জন্য বেঁচে গেছেন। রথীনবাবুর জন্য কড়া পুলিসি প্রোটেকশনের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। রথীনবাবু আজ পুলিসি পাহারায় আত্মগোপন করে আছেন। প্রয়োজনে রেডিওগ্রাম করে রথীনবাবুকে বান্দোয়ানে আনা হবে গোপনে। সান্যাল বাবুকে আজকেই আবার পুরুলিয়া ফিরতে হবে।

বদ্রীর চোখ উইন্ডস্ক্রিন ভেদ করে ডানদিকে নিবদ্ধ, যেখানে অযোধ্যা পাহাড় বিরাটত্বের গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বদ্রী মনে মনে জীবনানন্দ আওড়াচ্ছিল—'ভোরের বেলার মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি/দুপুরবেলার আকাশের নীল পাহাড় নীলিমা/সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর/অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীয় এই সীমা.....।' কী দেখছিস বদ্রী? কেদার জিজ্ঞেস করলেন। পাহাড়। পাহাড় দেখছি কেদারদা। 'দুপুরবেলার আকাশের নীল পাহাড় নীলিমা।' কোন কবিতাব লাইন বল তো? 'সময় সেতুপথে'। কেদারের ঝটিতি উত্তর। জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনার নমুনা শুনবি? শোন তাহলে—বলে কেদার শুরু করলেন, 'চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে/সূর্য আর সূর্যের বণিতা তপতি—/মনে হয় ইহাদের প্রেম/মনে করে নিতে গেলে, চুপে/তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে/আজ নয়,—কোনও এক আগামী আকাশে।'

অযোধ্যা ও বাঘমুণ্ডি পাহাড় ক্রমশ পেছনে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছিল। বদ্রী দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যাওয়া পাহাড়কে যতটা সম্ভব স্মৃতিতে ধরে রাখছিল। দুধসাদা প্রাইভেটকারটা ততক্ষণে পেরিয়ে এসেছে অনেক পথ। ওরা পেছনে ফেলে এল টাকরিয়া, ভাগাবান্দ, রাঙামাটিয়া, মানপুর। ড্রাইভার জানাল, বরাবাজার সামনেই।

ছোটনাগপুর মালভূমির এই পাথুরে রূপ দেখতে দেখতে বদ্রীর মনে অদ্ভুত একটা সুখ এবং তার থেকে এক ধরনের আনন্দের অনুভূতি হচ্ছিল ঠিকই। কিন্তু একটা বিমিশ্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল তার দ্বিতীয় সত্তায়। একটু আগে একটা অপ্রকাশিত চিন্তা ওর অবচেতনকে ধাক্কা দিচ্ছিল। এখন সেটা যেন কথা বলছে। বদ্রী বলছে, সতর্ক হও! বি অ্যালার্ট! এবার বদ্রীর অবচেতন মন নাড়া খেয়ে উঠল। শিরশির করে উঠল শরীরটা। বদ্রীর কাঁপুনি কেদারের নজরে পড়ল। কেদার কোমরে রাখা কোল্টটায় একবার হাত বুলিয়ে নিলেন। হঠাৎই যেন পরিবেশ পরিস্থিতি নীরব হয়ে গেল। সান্যালবাবুর তাই-ই যেন মনে হচ্ছিল।

দূরে দেখা যাচ্ছিল আর একটা পাকা রাস্তা। ডানদিক থেকে এসে এই রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। একটা যাত্রীবোঝাই বাস যাচ্ছে ওই রাস্তাটায়। ও রাস্তাটা কোত্থেকে আসছে? কেদারের কথার উত্তরে মিস্টার সান্যাল বললেন,

আমরা বলরামপুর দিয়ে এলে ওই রাস্তা ধরেই আসতাম। বরাবাজারে ঢোকার মুখে রাস্তা আবার মিশে যাবে। বরাবাজার পেরোলে খানিকটা পথ গিয়ে এই রাস্তা বিহারের ওপর দিয়ে যাবে অনেকটা জায়গা।

তাই নাকি! বদ্রী উচ্ছ্বসিত। তাহলে অন্য রাজ্যেও খানিকটা ঘোরা হয়ে যাবে।

বদ্রীদের সাদা প্রাইভেটকার তিন রাস্তার মোড়ে চলে এল। ওদের গাড়ির নম্বর ডব্লিউ বি টি ওয়ান ওয়ান থ্রি জিরো। গাড়ি বাঁক নিল বাঁদিকে। ওদের পেছনে চলে এসেছে যাত্রীবোঝাই বাসটা। রাস্তার ডানদিকে নিচে একটা বড়সড় মন্দির। বদ্রী ভাবছিল, এ দেশে মন্দিরের অভাব নেই। ওদের গাড়ি এখন স্পিড কমিয়েছে। পেছনের বাসটা তাই হর্ন দিচ্ছিল। ড্রাইভার ফের স্পিড বাড়াল। তিন মিনিটের মধ্যে ওদের গাড়ি বরাবাজার হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সান্যালবাবু বললেন, এখানে থানায় একটু দেখা করে যাই। কেদার বললেন, বদ্রী, বোস একটু। দু-জনে গাড়ি থেকে নেমে থানার দিকে চললেন। বদ্রীও গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় পায়চারি করতে শুরু করল। ততক্ষণে যাত্রীবোঝাই বাসটা বরাবাজার স্টপেজে এসে দাঁড়িয়েছে। কিছু লোক নামল। উঠল দু-একজন। বাস ছাড়ল। বদ্রী লক্ষ করল, বাসে সাঁওতাল বাগ্দী লোকজনই বেশি। ও অবশ্য পুরুলিয়াতেই শুনেছে বান্দোয়ান সাঁওতাল প্রধান এলাকা।

বরাবাজার হাসপাতালের সামনে একটা বিরাট বটগাছ। রোদ্দুর মাথায় প্রাইভেটকারে বসে এমনিতেই শরীর-মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। বটের ছায়ায় বদ্রীর খুব ভাল লাগছিল। গাড়ির ড্রাইভার বটগাছের গোড়ায় বসে বিড়ি টানছিল। একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বদ্রীর মনে হল শব্দটা এর আগে শুনেছে। না! বান্দোয়ানের দিক থেকে একটা কাঠবোঝাই লরি পুরুলিয়ার দিকে চলে গেল। লরির শব্দ ক্রমশঃ দূরে চলে যেতেই বদ্রীর কানে আবার সেই পরিচিত গাড়ির শব্দটা এসে ধাক্কা মারল। ওর সত্তার দ্বিতীয় স্তরে আবার তোলপাড়! বিপদ! না কি অন্য কিছু? সারা রাস্তাই বলতে গেলে বদ্রী অস্বস্তিতে এসেছে। কী একটা ব্যাপার বদ্রী ধরেও ধরতে পারছিল না। এদিকে সেই গাড়ির পরিচিত শব্দটা দ্রুতগতিতে কাছে চলে এসেছে।

বলরামপুর-বরাবাজার রোড ধরে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার দ্রুত আসছিল। অস্বাভাবিক দ্রুততায়। তিন রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে ডাইনে ঘুরে সেটা বরাবাজারের রাস্তায় উঠে এল। ঘনবসতি এলাকায় গাড়ির স্পিড না কমিয়ে স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও উঠল। ঝড় তুলে বরাবাজার বাসস্ট্যাণ্ড

পেরিয়ে কালো অ্যাম্বাসাডারটা বিপজ্জনকভাবে সাঁ করে বেরিয়ে গেল! বদ্রী চমকালো। ওর সমস্ত চিন্তারাশি এক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। কিন্তু ওর চোখের ক্যামেরায় গাড়ির নম্বর ছবি হয়ে গেল। অজানা কোনও নম্বর নয়। পরিচিত। ডব্লিউ বি এক্স, জিরো টু, টু জিরো। গাড়ির শব্দও পরিচিত। কাল রাতে রথীনবাবুর বাড়িতে হানা দিয়ে এই গাড়িটা নিয়ে আততায়ীরা পালিয়েছিল। বদ্রীর পাল্‌স বেড়ে গেল। এদিকে সান্যালবাবু আর কেদার চলে এসেছেন। বদ্রী চ্যাঁচালো—

কেদারদা! কালকের সেই গাড়িটা!

কোথায়?

এইদিকে গেল!

কখন?

এইমাত্র! জাস্ট।

কেদার দারুণ সুইফ্‌ট। দৌড়ে গাড়িতে উঠলেন। মিস্টার সান্যাল উঠলেন। ড্রাইভার আগেই ষ্টিয়ারিং ধরেছিল। বদ্রী ওঠামাত্রই কেদার বললেন, কুইক! যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, চল।

ডব্লিউ বি টি, ওয়ান ওয়ান থ্রি জিরো সাদা প্রাইভেট চলল টপ গিয়ারে। স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। ষাট, আশি, একশো! কালো গাড়িটা থেকে আমরা চার মিনিট পেছিয়ে আছি। বদ্রী বলল অস্ফুটে। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা বিহারে ঢুকে পড়ল। রাস্তার পাশে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—

'WELCOME'

BIHAR STATE GOVERNMENT

স্পিডোমিটারের কাঁটা থরথর করে কাঁপছে। ড্রাইভার চুপচাপ অখণ্ড মনোযোগে গাড়ি চালাচ্ছে। টানা রাস্তা। বদ্রীনারায়ণ ডব্লিউ বি এক্স জিরো টু টু জিরোর ইঞ্জিনের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেল।

আর একটু স্পিড বাড়ানো যায় না? বলতে বলতে স্পিডোমিটারের কাঁটা দেড়শো ছাড়িয়ে লাফাতে শুরু করেছে। সোজা রাস্তা বরাবর কালো বিন্দুটা দেখতে পেয়েছে বদ্রী। ওই তো!

কথাটা শোনামাত্রই কেদার আর মিস্টার সান্যালের কোমরের রিভলভার চকিতে হাতে উঠে এল। বদ্রীনারায়ণ বিপদের গন্ধ পেল। ওর অবচেতন

সত্তা বলল, সাবধান! শত্রুরা নিষ্ঠুর খুনী! মুখে বলল, কেদারদা, খুব সাবধান! বিপদ আসছে। দারুণ বিপদ!

দুটো গাড়ির দূরত্ব কমছে। কালো অ্যাম্বাসাডারটা নিশ্চিন্তেই যাচ্ছিল। ওরা জানে না পেছনের গাড়ি ওদের ফলো করছে। কেদার মজুমদার ভাবছিলেন, গাড়িটায় যদি কালকের লোকগুলোই থাকে, তবে শক্তিতে ওরাই বেশি। কী আগ্নেয়াস্ত্র ওদের কাছে আছে জানা নেই। আমাদের দু-জনের দুটো রিভলভার সম্বল। সান্যালবাবু বললেন, ড্রাইভার! ওদের ক্রস করে এগিয়ে যাও। ধীরে ধীরে দুটো গাড়ির ব্যবধান কমছিল। ডব্লিউ বি টি ওয়ান থ্রি জিরো প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে কালো গাড়িটাকে। দুটো গাড়ির ইঞ্জিনের গর্জন সমস্ত নৈঃশব্দ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছিল। এবার পাশাপাশি চলছে গাড়ি দুটো। বদ্রী দেখল ড্রাইভার নিয়ে গাড়িতে মোট চারজন লোক। প্রত্যেকের নিষ্পলক চোখে রক্ত ঠাণ্ডা করা চাহনি। ওরা সন্দেহ করছে? হ্যাঁ! বদ্রী ঠিক ধরেছে। কালো গাড়ির স্পিড হঠাৎ অনেক বেড়ে গেল, আর এগনো যাচ্ছে না। সাদা গাড়ি পিছোচ্ছে। অবস্থা দেখে সান্যালবাবু জানালা দিয়ে রিভলভার তাক করে চ্যাঁচালেন। হল্ট! না হলে গুলি করব!

বদ্রী দেখল, কথাটা শুনে ওরা ভয় পায়নি। ওদের চোখে রক্ত ঠান্ডা করা আগুন জ্বলল। বদ্রী দেখল, একজন মাথা নিচু করে কী যেন তুলছে। কোন অস্ত্র? কালো গাড়িটা এগিয়ে গেছে। বদ্রী আর কিছু দেখতে পেল না। ফের দূরত্ব বাড়ছে। সান্যালবাবু জানলার বাইরে মাথা গলিয়ে ফের চ্যাঁচালেন, হল্ট! গাড়ি থামাও! নইলে গুলি চালাব! ওরা কথা শুনল না। ওরা সাঙ্ঘাতিক স্পিডে বিপজ্জনকভাবে ছুটছে। শক্তিশালী ইঞ্জিন। এই গাড়ির ড্রাইভারের ক্ষমতা নেই তত জোরে গাড়ি চালানোর। সান্যালবাবু গুলি চালালেন। গুলি পেছনের চাকার ধার ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কারণ ওরা এঁকেবেঁকে গাড়ি চালাচ্ছে।

এবার কেদার বাঁদিকের জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে গুলি চালালেন। গুলি পেছনের বনেটে গিয়ে লাগল। গুলির ধাক্কায় গাড়িটাও টাল খেল কিন্তু স্পিড কমল না। বরং বাড়ল।

এবার গুলি ছুটে এল সামনের গাড়ি থেকে। গুলি এসে বনেটে লাগল। ঝাঁ ঝাঁ করে কেঁপে উঠল বদ্রীদের প্রাইভেটকার। কালো গাড়ি আরও দ্রুত এগোচ্ছে। সান্যালবাবু কালো গাড়ির পেছনের চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। দূরত্ব আরও বেড়েছে। এঁকেবেঁকে চলার জন্য গুলি গাড়ি থেকে অনেকদূর দিয়ে চলে গেল। তারপরই শোনা গেল শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ

নাগাড়ে শব্দ। এক ঝাঁক গুলি বদ্রীদের গাড়ির চারপাশ দিয়ে ছুটে গেল। সান্যালবাবু এই শব্দে চমকে গেলেন। এটা কিসের শব্দ? হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

সাবধান কেদারবাবু! ওরা এ-কে ৪৭ রাইফেল থেকে গুলি চালাচ্ছে। আমরা ঝাঁঝরা হয়ে যাব। বদ্রীও বলল, মনে হচ্ছে দারুণ বিপজ্জনক ওরা। কেদার মজুমদারের কোল্ট থেকে ততক্ষণে আর একটা গুলি ওদের গাড়ির জানালা ফুটো করে ভেতরে ঢুকে গেছে। সান্যালবাবু চেঁচিয়ে বললেন গাড়ি থামাও! ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল। কেদারের শেষ গুলিটা ওদের কারুর লেগেছে বলে বদ্রীর মনে হল। বদ্রীদের গাড়ি থেমে গেছে। বদ্রী দেখল কালো গাড়িটা অনেকদূর চলে গেছে। কিন্তু গাড়ির জানালা দিয়ে বন্দুকের নল দেখা গেল। বদ্রী আতঙ্কে চিৎকার করল। মাথা নিচু করুন! ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ। ডব্লিউ বি এক্স জিরো টু, টু জিরো থেকে ছুটে আসা এ-কে ৪৭ রাইফেলের এক ঝাঁক গুলি ডব্লিউ বি টি ওয়ান থ্রি জিরোর সামনের বনেট চুরমার করে দিয়ে ইঞ্জিনে গিয়ে লাগল। গাড়িটা টালমাটাল হয়ে কাত হয়ে গেল। সামনের দুটো টায়ারই দারুণ শব্দ করে ফেটে গেল। বদ্রী ড্রাইভারের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। কেদার মিস্টার সান্যালের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন। দুটো গুলি সামনের দিক দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন ফুটো করে, ছাদ ফুটো করে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে। দুটো দরজা হাট হয়ে খুলে গিয়েছিল। ওরা দ্বিরুক্তি না করে রাস্তায় বেরিয়ে এল। গাড়ির ইঞ্জিন তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। বনেটের রঙ পুড়ে ফট্‌ফট্‌ আওয়াজ হচ্ছিল। খোলা জায়গায় চারদিক থেকে বাতাস এসে উস্‌কে দিল আগুন। আগুন ছিটকে গিয়ে আশপাশের শুকনো পাতা ধরিয়ে দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে সব ঘটে গেল। বদ্রী রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল। ড্রাইভার ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। কেদার মজুমদারের চোখে-মুখে ছিল নির্লিপ্তি। মিস্টার সান্যাল রিভলভার বাগিয়ে কালো অ্যাম্বাসাডারটা লক্ষ্য করে শাসাচ্ছিলেন।

হারামজাদা! পালাবে কোথায়? ধরা তোমাদের পড়তেই হবে! কেদার বুঝতে পারছিলেন, আজকে কত বড় ফাঁড়া গেল। বদ্রীর চিন্তার অস্বাভাবিকতা কেদার মজুমদারকে সতর্ক করে দিয়েছিল। গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। দূরের একটা গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসছিল। আগুনের হলকা থেকে বাঁচতে ওরা জ্বলন্ত গাড়ি থেকে একশো হাত দূরে সরে গেল। কেদার বললেন—

মিস্টার সান্যাল! আপনার জন্য আজ সবার প্রাণ বাঁচল।

কেন?

এ-কে ৪৭ রাইফেলের শব্দটা বুঝতে আপনার দেরি হয়নি। আমরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

তবে বদ্রীকে সাবাশ দিতেই হবে। ওর জাজমেন্ট কারেক্ট ছিল।

এ জন্যই তো বদ্রীর কোন বিকল্প নেই!

কেদার অহঙ্কার করেই কথাটা বললেন। সান্যালবাবু বললেন, বদ্রী একেবারে রাইট টাইমে আমাদের মাথা নিচু করতে বলেছিল। বদ্রী বলল, কাল রাতেই মনে হচ্ছিল, ওদের সঙ্গে আমাদের ফের দেখা হবে। বদ্রীর কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস। ও খুব নির্লিপ্তির সঙ্গে আনমনে বলল, ওই গাড়িটার এক জনের গায়ে কেদারদার গুলি লেগেছে। লোকটার মর মর অবস্থা। বদ্রীর নীল চোখদুটো তখন অনেকদূরে আগামী দিন-ক'টার পরিস্থিতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করছে। দূরের গ্রামের লোকজন জ্বলন্ত গাড়ির কাছে চলে এসেছে। সকলের জিজ্ঞাসু চোখ। ক্যা হুয়া ? আঁগ লাগ গিয়া ক্যায়সে ? কেদার দেখলেন, লোকগুলো সবাই হিন্দিভাষী। তাই তো! আমরা তো এখনও বিহারের সিংভূম জেলার ওপরেই আছি! এদিকে মিস্টার সান্যাল তাঁর ওয়াকিটকির বোতাম টিপে কথা বলছেন।

হ্যালো! বান্দোয়ান পি এস ? আমি সদর থানার সান্যাল বলছি ? ওভার!

হ্যাঁ! বলুন। শুনছি। বান্দোয়ান পি এস বলছি। ওভার!

আমরা বিপদে পড়েছি! জিপ পাঠাও! আমরা বিহার সীমানার ভেতরে আছি। আমরা যেখানে আছি, তার কাছাকাছি অঞ্চল সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রা। ওভার!

ও কে স্যার। ওভার!

রহস্যের জটিল গ্রন্থি

বকুলরানির নিরুদ্দেশ হওয়া, রথীন সেনকে খুনের চেষ্টা, এ-কে ৪৭ রাইফেলসহ একটা ভয়ঙ্কর খুনী দল—এই তিনটে বিষয়কে আপাত-দৃষ্টিতে মেলানো সত্যিই শক্ত। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা গরম পরোটায় কামড় বসিয়ে কেদার বদ্রীকে কথাটা বললেন। স্থানীয় পুলিস এ সবের লিঙ্ক খোঁজার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না।

হ্যাঁ। আর এই তিনটে বিষয়কে আলাদা করলে কোনটাই সলভ্ হবে না।

ঠিকই বলেছিস। গোটা ঘটনাই আমাদের ভাল করে ডিসকাস করা দরকার।

বান্দোয়ানে এখন রাত সাড়ে ন-টা। বান্দোয়ান পুলিস বদ্রীদের রেসকিউ করে বান্দোয়ান নিয়ে যাবার পরে সারা বিকেল ওরা কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম সেরে নেয়। রথীন সেনেরই এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে ওরা আছে এখন। এ বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। কেদার বলছিলেন, একটা বিষয় ক্লিয়ার করে নেওয়া যেতে পারে।

কী বিষয়?

এ কে ৪৭ রাইফেলের বিষয়টা।

কেমন করে?

এই রাইফেল সাধারণ অপরাধীদেব কাছে থাকে না।

তা ঠিক।

ওইরকম পটু ক্রিমিনাল সাধারণভাবে হয় না।

তাও ঠিক।

তা হলে তোর বুদ্ধিতে কী বলে? এরা কারা হতে পারে বলে তোর মনে হয় বল তো!

হুঁ-উ-উ—কোনও উগ্রপন্থী দল?

কেদারের কপালে ভাঁজ পড়ল।

তুই যত তাড়াতাড়ি কথাটা বলে দিলি, মাথায় আসা সত্ত্বেও আমি তত তাড়াতাড়ি বলতে পারছিলাম না। ভালই হল। এক্স ওয়াই জেড—কিছু একটা ধরে কাজটা শুরু করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক স্তরের অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া এই রাইফেল জোগাড় করা অসম্ভব!

তা হলে রাজনৈতিক বিষয় এসে যাবে। কাগজে পড়েছি পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের উগ্রপন্থীরা এই রাইফেল আকছার ব্যবহার করছে।

হ্যাঁ। আর ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাও এরই সঙ্গে আমাদের বুঝে নিতে হবে। ছোটনাগপুর মালভূমি, সাঁওতাল পরগনা—এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি করছে উগ্র সাঁওতালিরা।

কিন্তু কাগজ-টাগজ পড়ে যেটুকু বুঝেছি, ভারতের মূল রাজনৈতিক স্রোতের বাইরে এখনও যায়নি ঝাড়খণ্ডের দাবিদাররা।

বাঃ! তোর কনসেপশন দারুণ ক্লিয়ার! পাঞ্জাব বা কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের মতো এরা বিদেশের সাহায্য নিয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করে না অন্ততঃ সেই অর্থে। কাজেই এ-কে ৪৭ ওয়ালারা এখানে কেন, ভাববার বিষয়।

হতে পারে উগ্রপন্থীরা পুলিসের তাড়া খেয়ে এদিকে ঢুকেছে।

তাও হতে পারে। আর একটা ভাবনাও মাথায় এসেছে। বিহারের ধানবাদ, জামশেদপুরে মাফিয়াদের সাম্রাজ্য। ওদের দলবলও এ সব অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়বার চেষ্টা করতে পারে।

তাহলে বকুলরানির নিরুদ্দেশ হওয়া ?

এ ব্যাপারে ইমিডিয়েট সোর্স তোর কিছু মাথায় এসেছে ?

আমি কিছু ভাবিনি।

রথীনবাবু বলেছিলেন, উনি বান্দোয়ানে আসার পর একজন মহিলা ওনাকে সাবধান করে দিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

মহিলাটির অস্বাভাবিক মৃত্যু উনি নিজের চোখে দেখেছিলেন, এ কথাও বলেছিলেন ?

হ্যাঁ।

ঘটনা সত্যি, স্থানীয় পুলিসের কাছে শুনলাম।

তাহলে ?

মহিলাটির স্বামী এবং খুব কাছের লোকেদের সঙ্গে কথা বলব। কাউকে সে সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছে কিনা বকুলরানি সম্পর্কে। ইমিডিয়েট আনুমানিক সোর্স এটুকুই দেখতে পাচ্ছি এখন।

তিন নম্বর ?

তিন নম্বর হল, দেখতে হবে, বকুলনীড়ের মালিকানা কাদের হাতে গেছে! কারাই বা সেখানে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং হাঁকাচ্ছে! ও কে! এনি কোয়েশ্চেন ?

হুঁ। ঠিকই আছে। তোমার স্ট্র্যাটেজির খুঁত ধরার সাধ্য আমার নেই। আমি কিছু সংযোজন করতে পারি শুধু।

এনি সংযোজন ?

না। এই মুহূর্তে নয়।

ব্যস!

পরদিন বেশ ভোরে দু-জনেই উঠে পড়ল। সূর্য না উঠলেও ভোরের মিষ্টি আলো আর নির্মল বাতাসের অভাব ছিল না। ওরা বান্দোয়ান-কুচিয়া রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর প্রকৃতির আস্বাদ নিচ্ছিল। ছবির মতো চড়াই-উৎরাই রাস্তা। কেন্দুপাতা সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে এখানকার সাঁওতাল-আদিবাসী গ্রামগুলোর মেয়ে-বউরা। বদ্রী বলল, আচ্ছা কেদারদা, কলকাতা থেকে এত

দূরে আদিবাসী পাহাড়ী এলাকা, কিন্তু যত্রতত্র বেশ বড়সড় সুন্দর সুন্দর এত মন্দির এল কোত্থেকে?

আমি যেটুকু পড়াশোনা করেছি, তাতে জানি, কংসাবতী নদীর তীর ধরে পুরুলিয়া থেকে শুরু করে বাঁকুড়া হয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত মহাবীর এখানে জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। এবং জৈনধর্ম প্রচারের বেশ কয়েকটা সেন্টারও গড়ে তুলেছিলেন।

সে কত বছর আগে?

এখন থেকে হাজার খানেক বছর আগে হবে।

এখন কি তার প্রভাব আছে নাকি?

ছোট্ট করে বলি জেনে রাখ।

বল।

এখানকার সাঁওতাল, ভূমিজ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের সংস্কৃতির শিকড় হল আদি-অষ্ট্রাল নিষাদ সংস্কৃতি। এরপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঢেউ আসে স্বাভাবিকভাবে। এর পরে মহাবীরের নেতৃত্বে জৈনরা আসে পরিকল্পিতভাবে। নতুন ধর্মের প্রবেশ ঘটে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে। গেড়েও বসে। জৈনধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা সারা পুরুলিয়া জুড়েই ছড়িয়ে আছে। এরপর আসে বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম-বিরহ-আবেগের প্রাবল্য আর উচ্ছ্বাস। সংক্ষেপে বোঝাতে পারলাম?

হ্যাঁ, বুঝলাম।

সামনে পূবদিকে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সূর্য উঠছে। এবার ওরা দু-জন আবার ফিরে চলল। একঝাঁক পাখি উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

তখন বেলা এগারোটা। বান্দোয়ান থানায় কেদার-বদ্রী জুটি আলাদা একটা ছোট ঘরে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। কেদার মজুমদারই বেশি প্রশ্ন করছিলেন। বদ্রী লোকটাকে দেখছিল। উত্তর দেবার ভঙ্গি আর লোকটার মানসিক অবস্থা বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল।

তোমার নাম কী?

হরি মাহাতো।

কী কাজ কর?

খেতিতে কাজ করি।

চাষের জমি আছে?

না।

চাষের কাজ না থাকলে কী কর?

জঙ্গল থেকে লাকড়ি গাছ্ কেটে কাঠ বিক্কিরি করি।

তোমার কথায় পুরুলিয়ার টান নেই তো? কেন?

আমি গরমের সময় ফি বছর হুগলি বদ্ধমানে খেতির কাজ করতে যাই। ও ভাষা শিখে নিইচি।

শুনলাম তোমার বউ হঠাৎ করে মারা গেছে?

হাঁ। —বদ্রী দেখল, লোকটার চোখে সত্যিই বিষাদ।

কী করে মারা গেল?

রাস্তা থেকে খাদে গিরে গিয়েছিল।

আচ্ছা, ওই হোটেলে কাজ করার আগে তোমার বউ, অর্থাৎ যমুনা মাহাতো কোথায় কাজ করত?

বকুল দিদিমণির বাড়িতে।

বকুল দিদিমণি কেমন মানুষ ছিলেন?

খুব ভাল। মাইনা ভাল দিতেন। খেতে দিতেন রোজ। বউ আমার খাবার লিয়ে যেত ঘরে। তবে—

তবে কী?

বকুল দিদিমণির মাথায় ছিট ছিল।

সব সময় ছিল?

না।

কখন থেকে হয়েছে?

বচ্ছরখানেক। ভূতের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছিল।

কি রকম?

রাত্তিরবেলা ভূত আসত।

কে বলেছে?

আমার বউ বলেছিল।

তোমার বউ নিজের চোখে দেখেছিলো বলেছে?

হাঁ।

কেমন ভূত?

মেইয়েছেলে ভূত।

তোমার বউ যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন তোমাকে কিছু বলেছিল?

না। তবে আগের দিনটা খুব সিঁটিয়ে ছিল।

তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি?

করেছি। কিছু বলেনি। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে কী সব বিড়বিড় কচ্ছিল।

কী বলছিল ? মনে আছে তোমার ?

সে তো রোজই ঘুমের ঘোরে অনেক কথা বলত।

তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে ভাব ছিল ?

ছিল। খুব ছিল।

আচ্ছা, তুমি একটু মনে করে দেখ তো, সেদিন ঘুমের ঘোরে তোমার বউ কী কী বলেছিল ?

হরি মাহাতো চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবল। বদ্রী হরি মাহাতোর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বদ্রীর অন্য কোনও দিকে হুঁশ ছিল না। হরি মাহাতোর কথা থেকে কোন সূত্র মেলে কিনা তারই অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে আছে বদ্রী। এবার হরি মাহাতো কথা বলল।

বউ আমার কথা বলতেছিল।

আর কি বলছিল ?

আর একটা কথা কী যেন বলতেছিল! —বলে চুপ করে গেল ও।

বদ্রীর চোখে পলক পড়ছিল না। ওর নার্ভগুলো টান টান হয়ে ছিল। ওর তৃতীয় চক্ষু অপেক্ষা করছিল কিছু জানার জন্য। কেদার হরি মাহাতোকে কথা বলার মধ্যেই আটকে রাখলেন, বল বল! ভেবে বল, কী বলছিল আর!

বলছিল দেখে ফেলেছে।

কে দেখে ফেলেছে ? কী দেখে ফেলেছে ? বল বল!

এবার বদ্রীনারায়ণ এগিয়ে এলো হরি মাহাতোর কাছে। কেদার বললেন, বল বল! বদ্রী ওর নীল চোখদুটো হরি মাহাতোর চোখের ওপর ফেলে জিজ্ঞেস করল, কে দেখে ফেলেছে ? ভেবে বল!

বদ্রীর সেই নারীসুলভ নীল চোখের দিকে তাকিয়ে হরি মাহাতোর সামনে থেকে পারিপার্শ্বিক সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। ও দেখল শুধু সেদিনকার রাতের দৃশ্য। যমুনা বিছানায় শুয়ে আছে। কেদার বললেন, যমুনা বিড়বিড় করে কী বলেছিল তুমি শুনেছ। ভুলে গেছ। মনে পড়বে। বল!

বউ বলেছিল, দেখে ফেলেছে। দেখে ফেলেছে।

কে দেখে ফেলেছে এ কথাও তোমার বউ বলেছিল। তুমি শুনেছ। বল!

দেখে ফেলেছে। দেখে ফেলেছে। বউ ছটফট করছিল। বলছিল, দেখে ফেলেছে। ধীরুবাবু।

ধীরুবাবু নামটা শোনামাত্রই বদ্রীর গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠল। কেদার নামটা

নোট করে রাখলেন। হরি মাহাতো ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। ও খানিকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার কী হয়েছিল ?

কেদার হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। এবার তুমি যাও ! তোমার কোন ভয় নেই। এ নিয়ে রাস্তাঘাটে কিছু বল না। বুঝলে !

হরি মাহাতো ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চলে গেল।

কেদার অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। বদ্রীও ছিল চুপচাপ। দু-জনের চিন্তার রেখাটি চলছিল সমান্তরালে। দু-জনেই ভাবছিল, যা করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। এত তাড়াতাড়ি একটা নাম পাওয়া যাবে, সেটা ওদের ধারণার অতীত ছিল! তবে রহস্য এখনও রহস্যই। রহস্য আরও অতল অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে। কেদার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বদ্রী। ভেবে দ্যাখ তো ঘটনাগুলো এক সুতোয় গাঁথা যায় কি না !

বল !

বকুলরানি নিখোঁজ, রথীন সেনের দু-বছর পরে বান্দোয়ান আগমন, আগেই বকুল নীড়ের হস্তান্তর, যমুনা মাহাতোর সঙ্গে দেখা, যমুনার সতর্ক করে দেওয়া, যমুনার অস্বাভাবিক মৃত্যু, রথীন সেন ও মনোঞ্জনবাবুর উদ্যোগে রহস্য উদ্ধারে গোয়েন্দা নিয়োগ, গোয়েন্দা আসার সঙ্গে সঙ্গে রথীনবাবুকে খুনের চেষ্টা, এ-কে ৪৭ সহ খুনীর দল, বকুল নীড়ে ভূতের খবরও জানা গেল। যমুনা মাহাতো ভয় পেয়েছিল। কেন ? রথীন সেনের সঙ্গে তার কথোপকথন দেখে ফেলেছিল। কে দেখেছিল ? ধীরুবাবু। কিছু বোঝা গেল ?

বোঝা গেল।

কী বোঝা গেল ?

জট খুলে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আমি দেখতে পাচ্ছি, কেন্দ্রবিন্দুতে ধীরুবাবু। বাদবাকি ঘটনাগুলো উপগ্রহের মতো চারপাশে ঘুরছে।

মেয়েছেলে ভূত ব্যাপারটা আমার কাছে খটকা লাগছে !

ধীরুবাবুর সঙ্গেই মেয়েছেলে ভূতের রহস্য জড়িত। তুমি দেখে নিও।

সুতরাং আগে ধীরুবাবু।

হ্যাঁ। এখন ধীরুবাবু।

বান্দোয়ান থানার ও সি ছুটিতে ছিলেন। সেকেণ্ড অফিসার জীবন মুখার্জি পুরুলিয়ারই লোক। বাড়ি পঞ্চকোটে। এই পঞ্চকোটের রাজবাড়িতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। জীবনবাবুই কেদার মজুমদারকে

এই তথ্যটা দিলেন। জীবনবাবু নিজের জন্মভিটা সম্পর্কে খুব স্পর্শকাতর। পঞ্চকোটের ঐতিহ্য নিয়ে উনি বেশ গর্বিতও বটে। জীবনবাবু বলেছিলেন, জানেন কেদারবাবু, পুরুলিয়াকে নিয়ে মাইকেল কবিতাও লিখেছেন। কবিতাগুলো আমার কণ্ঠস্থ।

বলুন দেখি একটা কবিতা! শুনি। কবিতা আমার বড় প্রিয় বিষয়।

বলছি, শুনুন—চতুর্দশপদী কবিতা এটা—

'পাষাণময় যে, সে দেশে পড়িলে / বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে? কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে / হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে/ শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে, / অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে/ এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে / পরিমল ধনে ধনী করিয়া আনিলে!'

কবিতা শেষ করে জীবনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, পুলিসের চাকরি করি বলে এখনও রুক্ষ হয়ে যাইনি কেদারবাবু! এরপরই কর্তব্য সচেতন জীবন মুখার্জি কাজের কথায় ফিরে এলেন।

আচ্ছা! কী জানতে চান বলছিলেন?

বান্দোয়ানে ধীরুবাবু বলে আপনারা কাউকে চেনেন নাকি?

অব কোর্স! ক'দিন আগেই থানায় এসেছিল।

কেন?

ধীরুবাবুর ভাই হীরেন ঘোষ নাকি বাড়ির সোনাদানা চুরি করে পালিয়েছে। তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল কি না জানতে এসেছিল।

হীরেন ঘোষ বাড়ি থেকে পালিয়েছে কতদিন আগে?

এই মাস দু'য়েক। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, হীরেন ঘোষকে আমরা যদ্দুর জানি, উনি এই কাজ করতে পারেন বলে মনে হয় না।

ধীরুবাবু কেমন লোক?

ধীরেন ঘোষ আগে সুবিধের লোক ছিল না। দু-নম্বরী রাস্তায় দু-পয়সা কামিয়ে এখন সাধু লোক হয়েছে।

জীবনবাবু! আমাদের দ্রুত কতকগুলো কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে বান্দোয়ান পুলিসের সাহায্য চাই।

তা পাবেনই। সান্যালবাবু আপনাদের জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেছেন।

তাহলে আজ সন্ধ্যেয় আমরা আচমকা ধীনের ঘোষের বাড়ি সার্চ করব। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে একটু রিস্ক নিয়েই এটা করছি।

ঠিক আছে। তাই হবে।

বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে মেঘ জমল। পাহাড়ি জনপদে

আলো-আঁধারীর অদ্ভুত লুকোচুরি দেখে বদ্রী মুগ্ধ হয়ে গেল। সুউচ্চ পাহাড় প্রকৃতির এক দারুণ সৃষ্টি। কত হাজার কোটি বছর আগে সূর্য থেকে ছিটকে আসা জ্বলন্ত পৃথিবীতে এই পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল কে জানে! কিন্তু কেদার বদ্রীকে মুগ্ধ থাকতে দিলেন না। বললেন, বদ্রী, রেডি হয়ে নে। আজকের অভিযানে সাফল্য না এলে নতুন করে অঙ্ক কষতে হবে।

সন্ধ্যে ছ-টা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি নামল। পাহাড়ি গঞ্জ এলাকা নীরব হয়ে গেল। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বৃষ্টি একটু ধরল। বৃষ্টি ভালই হয়েছে। ফলে সন্ধ্যের দোকানপশার তেমন একটা জমেনি। রাত আটটা নাগাদ ওরা অপারেশনে বেরোবার জন্য রেডি হল। সেকেণ্ড অফিসারসহ ছ-জন পুলিসকে নিয়ে কেদার বদ্রী জুটি ধীরেন ঘোষের বাড়ির কাছে এল সাড়ে আটটা নাগাদ। বান্দোয়ান থেকে মেদিনীপুরমুখী পাকা রাস্তা ধরে মিনিট কুড়ি হেঁটে রাস্তার ডানদিকে ধীরেন ঘোষের বাড়িটাকে ভূতুড়ে বাড়ির মতো নিস্তব্ধ লাগছিল। একসময় যেটা বকুল নীড় ছিল সেটা এখন মার্কেট হচ্ছে—নির্মীয়মাণ সেই বাড়িটাও দেখালেন জীবন মুখার্জি। কেদার মজুমদার ভাবছিলেন, কোন সুযোগ দেওয়া নয়, আচমকা আঘাতে সত্যি জেনে নিতে হবে। বদ্রী ছিল নিশ্চুপ। পাঁচ জন মানুষ বাড়ি ঘিরে পজিশন নিল।

চৌকো ধরনের একতলা পাকাবাড়ি। রাত সাড়ে আটটাতেই একেবারে নিস্তব্ধ। এখনই সব খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে! জীবন মুখার্জি, কেদার আর বদ্রীনারায়ণ গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সোজা বাড়ির বারান্দায় চলে এল। বারান্দায় পা রেখেই বদ্রীর মনে হল, কে যেন ক্ষীণস্বরে গোঙাচ্ছে। কোন মহিলার গলা। বাড়ির মধ্যেকার কোন ঘর থেকে গোঙানির শব্দটা আসছে। আর কোথাও কোন শব্দ নেই। জীবনবাবু এবার জোরে কড়া নাড়লেন।

বাড়িতে কে আছেন? দরজা খুলুন! দরজা খুলুন! ধীরেনবাবু? বাড়ি আছেন না কি! দরজাটা খুলুন তো!

সামনের ঘরের ভেতরে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলল। বাইরের বারান্দাতে আলো জ্বলল। উঠোনটা আলোকিত হয়ে গেল। —কে! মহিলা কণ্ঠ পাওয়া গেল।

আমি থানার মেজবাবু। ধীরেনবাবু বাড়ি নেই?

না।

কোথায় গেছে?

পুরুলিয়া।

ঠিক আছে। দরজাটা খুলুন। আমি থানার মেজবাবু জীবন মুখার্জি বলছি।

আপনি ধীরেনবাবুর স্ত্রী তো! আপনি তো আমাকে চেনেন! আপনার দেওর হীরেন ঘোষের নামে ডায়েরি করতে আপনিও তো থানায় গিয়েছিলেন। হীরেন ঘোষের খবর পাওয়া গেছে। তাই কিছু ইনফরমেশনের জন্য এসেছি।

এই কথায় কাজ হল। দরজা খুলে গেল। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে খোলা দরজার সামনে। এবারে কেদার কথা বললেন।

আমাদের কাছে খবর আছে, হীরেনবাবু আজ এখানে আসতে পারেন। আমরা একটু বাড়িটা ভাল করে দেখতে চাই। বদ্রীনারায়ণ দেখল, মহিলার চোখেমুখে দ্বিধা। কেদার আর দেরি করলেন না। জীবনবাবু আর বদ্রীকে নিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। মহিলাটি এবাব প্রতিবাদ করল। বাড়ির কর্তা বাড়িতে নেই। এই অবস্থায়—

আমরা আইন মেনেই কাজ করব—কেদারের ঝটিতি জবাব।

সবগুলো ঘর খোঁজার ইচ্ছে কেদার মজুমদারের ছিল না। কেদার বদ্রীকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন ঘরে গোঙানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে? বদ্রী ওর সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে ডুব দিল গভীরে। অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ। মহিলা কণ্ঠের। শব্দের উৎস ডানদিকে। বদ্রী প্রায় চোখ বুজেই ডানদিকে চলল। সঙ্গে কেদার। পেছনে জীবনবাবু। তার পেছন পেছন অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ধীরেন ঘোষের স্ত্রীও যাচ্ছিল। ডানদিকে গিয়ে ফের ডানদিকে একটা সরু প্যাসেজ। তার দু-দিকে চারটে ঘরই তালাবন্ধ।

আচ্ছা বৌদি, এই ঘরগুলোয় কী আছে?

তামাক।

তামাক?

হ্যাঁ। আমার স্বামী তামাকের বিজনেস করছে এখন।

ঠিক আছে। ঘরগুলো খুলে দেখব আমরা।

চাবি তো আমার কাছে নেই। আমার স্বামীর কাছে আছে।

প্যাসেজটায় তামাকের তীব্র গন্ধ আসছিল। বদ্রী চারটে ঘরের সামনেই খানিকক্ষণ করে দাঁড়িয়ে কিছু বুঝে নিচ্ছিল। একটা মিষ্টি ঘুম এসে যাওয়া গন্ধ এসে লাগল ওর নাকে। তামাকের ব্যবসার কথা শুনে বদ্রীর চিন্তাটা মোচড় দিল অন্য খাতে। ও এসে দাঁড়াল প্যাসেজের মধ্যেকার ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরে। ইথার তরঙ্গ বাহিত হয়ে কারুর শরীরের তীব্র যন্ত্রণায় আর্তি ভাসছিল বাতাসে। বদ্রীর তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মন তা ধরে ফেলল। বদ্রী বলল, এই ঘরটাই শুধু খুলে দেখুন। তক্ষুণি ওই মহিলা চিৎকার করে উঠে বললেন, না! ঘর খুলবেন না! আমাদের ব্যক্তিগত ঘরদোর দেখবেন কেন আপনারা!

আইনের বাইরে আমরা কিছু করব না। যা কিছু হবে, আপনার সামনেই হবে। আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। চাবি থাকলে দিন, না হলে আমরা দরজা ভাঙব।

চাবি আমার কাছে নেই।

ঠিক আছে! —বলে জীবনবাবু বারান্দায় চলে গেলেন। তারপর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন কনস্টেবলকে ডেকে নিয়ে এলেন। কেদারের কাছে 'মাস্টার কি' ছিল। প্যাসেজের মুখে কনস্টেবল পাহারায় রইল। কেদার ততক্ষণে 'মাস্টার কি' অ্যাডজাস্ট করে তালা খুলে ফেলেছেন। জীবনবাবুর হাতের টর্চের আলোয় ঘরের মধ্যাংশ তখন আলোকিত। বস্তা ঠাসা ঘরটায়।

কিসের বস্তা?

তামাকের।

আফিঙেরও গন্ধ পাচ্ছি। কেদার বললেন। বদ্রীনারায়ণ বলল, মিষ্টি গন্ধটা আফিঙের? কেদার চিন্তিতমুখে বললেন, হুঁ! জীবন মুখার্জি আর কেদার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের কোণ থেকে এক মহিলার গোঙানি শোনা গেল। টর্চের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে। দেখা গেল, এক শীর্ণকায়া মহিলা একটা তেলচিটে কাঁথায় শুয়ে আছেন। ইনি কে? বকুলরানি? এই গুদামঘরে কেন? বকুলরানি নামটা শোনামাত্রই ধীরেন ঘোষের স্ত্রীর মুখে আতঙ্ক আর ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল। জীবনবাবু বললেন, বকুলরানিকে আমি চিনতাম না। বৌদি! আপনি কি চেনেন? ইনিই বা কে? এই বদ্ধ গুদামঘরে এনাকে কে রেখেছে? কেদার মজুমদার চেঁচিয়ে বললেন, শুধু তাই নয়, মহিলাকে রোজ আফিঙ খাইয়ে নিস্তেজ করে ফেলা হয়েছে। বলুন ইনি কে?

আমি জানি না! না! না। না! বলে একেবারে ভেঙে পড়ল ধীরেন ঘোষের স্ত্রী।

বদ্রী ভাবছিল, রথীন সেনের যা বয়স, তাঁর দিদির বয়স আরও বেশি হবে। এই ভদ্রমহিলার বয়স আরও কম। ইনি কে? ধীরেন ঘোষের স্ত্রীর মুখ থেকে কিছুতেই কোন কথা বের করা গেল না।

সেই রাত থেকেই ধীরেন ঘোষের বাড়িতে পুলিস পাহারা বসল। এখনও পর্যন্ত সব কাজ হচ্ছিল লোক জানাজানি না করেই। কেদার মজুমদারের বক্তব্য হলো, জানাজানি হয়ে গেলে অপরাধীরা আর ফাঁদে পা দেবে না।

অসুস্থ মহিলাকে পরদিন সকালেই চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেডিওগ্রাম করে কেদার ঘটনাটা সদর থানায় মিস্টার সান্যালকে জানিয়ে দিলেন। পরে বদ্রীনারায়ণকে নিয়ে ফের

গেলেন ধীরেন ঘোষের বাড়ি। ধীরেন ঘোষের স্ত্রীকে দু-জনে মিলে ম্যারাথন জেরা শুরু করল। ভদ্রমহিলার মনের জোর কম নয়! ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। কোন কথাই বের করা গেল না মহিলার মুখ থেকে। শেষ পর্যন্ত বদ্রীনারায়ণের নীল চোখের তীব্র চাহনির কাছে হার মানতে হল। বদ্রীনারায়ণের সেই চোখ, যে চোখ গভীরতম সত্যকে খুঁজে বেড়ায় সব সময়। সেই চোখের দৃষ্টির সামনে বলে ফেললেন, উদ্ধার করা ওই মহিলা হলেন নিরুদ্দেশ হীরেন ঘোষের স্ত্রী। কথাটা বলে ফেলে একেবারে ভেঙে পড়লেন ধীরেন ঘোষের স্ত্রী রমা ঘোষ। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, দোহাই আপনাদেব! আমার স্বামী এ কথা জানলে আমায় খুন করে ফেলবে!

তাহলে আপনার স্বামীই এনাকে আটকে রেখেছিল?

হ্যাঁ।

কেন?

তা আমি জানি না।

ধীরেন ঘোষের বাড়িতে পুলিস পাহারা রইল। কেদার মজুমদার ফের বান্দোয়ান থানায় গেলেন। রেডিওগ্রামে সেখান থেকে পুরুলিয়া সদরে মিস্টার সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

হ্যালো! আমি কেদার মজুমদার বলছি! ওভার!

বলুন! সান্যাল বলছি। খবর কী? ওভার!

যে অসুস্থ মহিলাকে আজ সকালে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল, উনি ধীরেন ঘোষের ভাই হীরেন ঘোযের স্ত্রী। হীরেন ঘোষ নিখোঁজ হওয়ার পর ধীরেন ঘোষ তাঁকে বাড়িতে আটকে রেখেছিল। প্রতিদিন আফিঙ খাইয়ে তাঁকে কাবু করে রাখা হয়েছিল। ওভার!

আমি হাসপাতালে সুপারিনটেনডেন্টকে ফোন করছি। মহিলাটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি। ফারদার কোন ডেভলপমেন্ট হ'লে খবর দেবেন। ভদ্রমহিলার কাছ থেকে কিছু জানতে পাবলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেব। ওভার!

হঠাৎ আলোর রেখা

দুপুরবেলা স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে কেদার আর বদ্রীনারায়ণ বিশ্রাম নিচ্ছিল। কেদার বলছিলেন, কী রে বদ্রী! ঘটনার গতি কোন দিকে যাচ্ছে ধরতে পারছিস কিছু?

'মেয়েছেলে ভূত' আর 'ধীরুবাবু দেখে ফেলেছে'—এই দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার।

হ্যাঁ। এই দুটো বিষয় ক্লিঞ্চ করতে হবে। ধীরেন ঘোষ এখনও পর্যন্ত পুরুলিয়া থেকে ফেরেনি। যাকগে! একটু ঘুমিয়ে নিই। তুই একটু রেস্ট নিয়ে নে।

না। আমি 'চেঙ্গিজ খান' পড়ব। উপন্যাস আদ্দেক পড়ে ফেলে রাখতে ভাল লাগে না।

কেদার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। বদ্রী ভাবছিল, নানা জটিল সমস্যার মধ্যেও কেদাবদা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিতে পারেন। একদিকে এটা খুব ভাল। ঘুম থেকে উঠে খোলা মনে কাজ করা যায়। কিন্তু কাল রাত থেকেই বদ্রীর মনটা আবার তোলপাড় করতে শুরু করেছে। এ পর্যন্ত যতটা এগনো গেছে, তাও কম নয়। মৃতা যমুনা মাহাতোর স্বামীকে জেরা করার সিদ্ধান্ত কেদারদার দারুণ অ্যাচিভমেণ্ট। এর ফলে ধীরেন ঘোষের নামটা জানা গেল। কিন্তু হীরেন ঘোষেব স্ত্রীকে আটকে রাখার সঙ্গে বকুলরানির নিখোঁজের তো কোনও সম্বন্ধই নেই। আবার বদ্রীর সতর্ক চোখ ফাঁকি দিতে পারেনি একটা ব্যাপার। তা হল, বকুলরানির নাম শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল ধীরেন ঘোষের স্ত্রী। কিন্তু কেন? স্বীকারোক্তি করে রমা ঘোষ দারুণ ভয় পেয়েছে। চোখে-মুখে মৃত্যুভয়। তাই বা কেন? সব ব্যাপারটাই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আর একটা অবিশ্বাসের বক্ররেখা ওর মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল! সেটা ভয়ানক। বদ্রীর দু-দিন ধরে তাই মনে হচ্ছে। ওর দ্বিতীয় সত্তা ওকে আবার তাড়া করে ফিরছে। ধীরেন ঘোষের বাড়ির বারান্দায় লাগানো ফটোর লোকটাকে ও দত্ত ট্রেডার্সে দেখেছে। বদ্রী আর ভাবতে চাইল না। উপন্যাসে মন দিল। যেখানে জালাল-উদ-দিনের জিজ্ঞাসার উত্তরে গুরগঞ্জ নগরাভিমুখী হাজি রহিম বললেন, 'আমি পাঁচ সমুদ্রের মাঝখানে এই যে চেপটা দুনিয়াটা আছে, তার ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াই, নগর, মরুদ্যান ও মরুভূমি ঘুরি, খুঁজে ফিরি সেই মানুষ, যার ভেতরে জ্বলছে দুর্বার উদ্দীপনার আগুন। আমি চাই অসাধারণকে দেখতে, সত্যিকারের বীর ও সত্যাশ্রয়ীকে জানতে।' বদ্রী উপন্যাসের মধ্যে ডুব দিয়েছে ততক্ষণে। নিষ্ঠুর কিন্তু মহাবীর চেঙ্গিজ খান সারা এশিয়া মহাদেশ তছনছ করে রুশিয়ার ইওরোপীয় অংশেও হানা দিচ্ছেন। যুদ্ধ, রক্ত, মৃত্যু, আহতদের আর স্বজন হারানো নারী-পুরুষের হাহাকারে সমগ্র যুগটা আচ্ছন্ন। বই পড়তে পড়তে একসময় বদ্রীও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে দু-জনের বিকেল সাড়ে চারটে হয়ে গেল।

বিকেলে রেডিওগ্রামে দুটো গুরুত্বপূর্ণ খবর দিলেন সান্যালবাবু। সান্যালবাবু তখন টগবগ করে ফুটছিলেন। রিসিভার ধরেই কেদার সেটা টের পেলেন।

হ্যাল্লো! কেদারবাবু তো? শুনুন! আপনার কাজ অনেকটাই এগিয়ে রেখেছি। বেটাচ্ছেলেরা আমাদের খুনের চেষ্টা করেছিল মশাই! সেদিন থেকেই আমার রোখ চেপে গেছে। শুনুন! হীরেন ঘোষের স্ত্রী এখন সুস্থ আছেন। তার সঙ্গে কথা বলেছি। ওভার!

কিছু জানা গেল? ওভার!

অনেক কিছুই জানা গেছে। আপনার কাজ বোধহয় এবার তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলতে পারবেন। ওভার!

বলুন! ওভার!

হীরেন ঘোষের স্ত্রীর নাম সাবিত্রী ঘোষ। গত দু-মাস আগে হীরেন ঘোষের সঙ্গে দাদা ধীরেন ঘোষের দারুণ ঝগড়া হয়। সাবিত্রীদেবীর বক্তব্য, সেই সময় হীরেনবাবু উত্তেজনার বশে দাদাকে বলেন, দু-বছর আগে কী অন্যায় করেছ সব আমি জানি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে সব বলে দেব। এরপরই ধীরেনবাবু হীরেন ঘোষকে খুনের ভয় দেখাতে থাকে। ধীরেন ঘোষ এর আগেও খুন-টুন করেছে বলে সাবিত্রীদেবীর অনুমান। হীরেনবাবুর সন্দেহ হয়, তার দাদা সত্যিসত্যিই তাকে খুনের চেষ্টা করছে, তখন সে পালায়। এদিকে ধীরেন ঘোষ এবং তার স্ত্রী রমা ঘোষ সাবিত্রীদেবীকে ঘরে আটকে রেখে নির্যাতন শুরু করে দেয়। মারধর সহ্য করেও সাবিত্রীদেবী বলেননি তাঁর স্বামী কোথায় আছেন! পুলিসকে জানানোর সাহস হয়নি হীরেন ঘোষের। হীরেন ঘোষ প্র্যাকটিকালি খুবই ভীরু প্রকৃতির লোক বলেই মনে হল সাবিত্রীদেবীর কথায়। বুঝতে পারছেন তো! ওভার!

হ্যাঁ। হীরেন ঘোষ কোথোয় আছে সাবিত্রী ঘোষ কি তা জানিয়েছে? ওভার!

হ্যাঁ। আসানসোলের চেলিডাঙা রেল কলোনিতে একজন পরিচিত লোকের কাছে। পুলিসের একটা টিম পাঠিয়েছি। রাতের মধ্যে চলে আসবে আশা করি। ওভার।

আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কালকে বান্দোয়ান আসবেন না কি? ওভার!

বকুল নীড়ের জমি হস্তান্তরের বিষয়টা জানতে কোর্টে আর সেট্‌লমেণ্ট অফিসে লোক পাঠিয়েছি। ক্লিয়ার তথ্য সব পেয়ে গেলে কালই সব নিয়ে চলে যাব। ওভার!

রথীনবাবু ও হীরেন ঘোষকে নিয়ে আসবেন। সাবিত্রীদেবীর কাছ থেকে এর বেশি আর জানার নেই। উনি হাসপাতালেই থাকুন। এদিকে ধীরেন ঘোষ এখনও বাড়ি ফেরেনি। আর একটা কথা—বলে কেদার দু-সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন। বদ্রী পাশ থেকে বলে উঠল, মনোরঞ্জন দত্তকে জানিয়ে আসতে বলুন! কথাটা শুনে কেদার বদ্রীর দিকে তাকালেন এক মুহূর্ত। তারপর সান্যালকে বললেন, আপনি মনোরঞ্জনবাবুকে বলবেন, বকুলরানি সমস্যার সমাধান হল বলে। রথীনবাবুকে নিয়ে বান্দোয়ান যাচ্ছেন, সেটা মনোরঞ্জনবাবুকে জানিয়ে দেবেন। ওভার!

কথা শেষ কবে কেদার মজুমদার জীবন মুখার্জিকে বললেন, আজ রাত আর কাল দিনেরবেলাটুকু একটু নজর রাখবেন, বান্দোয়ান দিয়ে কোন সন্দেহজনক গাড়ি-টাড়ি পুরুলিয়ার দিকে যায় কি না। জরুরী ভিত্তিতেই একটু নজর রাখবেন। কেদাব রাতে ফের সান্যালকে রেডিওগ্রাম করে বললেন, একটু আর্লি আসার চেষ্টা করবেন।

শেষের দিনে ভয়ানক দুর্যোগ

রাতে বিছানায় শুয়ে বদ্রী ভাবছিল, প্রত্যেকটা ঘটনা যেদিকে এগোচ্ছে তাতে কালই মূল অপরাধীর সনাক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কেদার চুপ করে আছেন দেখে বদ্রী আর ওঁকে ঘাঁটালো না। কেদার গভীর চিন্তায় মগ্ন। দু-জনের চিন্তা যদি এই মুহূর্তে সমান্তরালে চলে, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করে যে লোকটা সামনে এসে যাচ্ছে, সেটা চিন্তারই ব্যাপার। বদ্রীর ক্যালকুলেশন অনুযায়ী গতকাল পর্যন্ত ধীরেন ঘোষকে কেন্দ্র করেই অপরাধের বৃত্তটা পাক খাচ্ছিল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। নতুন করে ফাঁদ পাতা হয়েছে। কে অপরাধী, জাল গোটালেই বোঝা যাবে। এবার কেদার কথা বললেন, কি রে! ঘুমিয়ে পড়লি? —না। ঘুমোইনি। ভাবছি। —ভাব। পরিষ্কার চিন্তা করা এই সময় খুবই দরকার। বলেই কেদারও ডুব দিলেন ঘটনাপ্রবাহের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে।

পরদিন সকাল থেকেই আকাশ ছিল নির্মেঘ। পাহাড়ে পাহাড়ে সেগুন, কড়াই, কাঞ্চনগাছে হালকা বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবুও অদ্ভুত এক গুমোট কেদার এবং বদ্রীনারায়ণের মনে। অঙ্ক অনুযায়ী আজকে যদি

গত দু'বছরের অন্ধকারের জট না খোলে, তবে তার সমাধান করা আর সময়সাপেক্ষ হবে।

দু-জনেই স্নান করে টিফিন সেরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর বেরিয়ে পড়ল কাজে। যাবার পথে পূর্বতন বকুলনীড়ের চারপাশটা একবার নজর করে নিল ওরা। সামনের দিকে কনস্ট্রাকশনের কাজ চললেও ভেতরটা একই আছে। মোড়ের মাথায় এসে ওরা দেখল, কেদারের কথা অনুযায়ী সিভিল ড্রেসে পুলিস গাড়িগুলোর ওপর নজর রাখছে। বদ্রীর মনটা কেন জানি ছটফট করছিল। আজকের আবহাওয়া এত ভাল হওয়া সত্ত্বেও এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বদ্রীকে সুখী করতে পারছিল না। ওর ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল হয়ে উঠছিল ক্রমশ। কেন এই চাঞ্চল্য ? বদ্রী ভাবছিল, আবার কি কোন বিপদ আসবে ?

ওরা দু-জন যখন পুলিস স্টেশনে পৌঁছল, তার পরে পরেই সদর থানার জিপ নিয়ে বড়বাবু মিস্টার সান্যাল হাজির। জিপ থেকে নামলেন রথীন সেন। কেদারকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।

আরে! কেমন আছেন ? কাজ এগোল কদ্দুর! আমাকেই তো দেখি আপনারা অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে দিলেন !

কেদার হেসে বললেন, দেখা যাক, আপনার অজ্ঞাতবাস ঘোচানো যায় কি না।

মিস্টার সান্যাল এবার কেদারকে বললেন, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। আর রথীনবাবু! আজকে থানাতেই থাকুন দিনেরবেলাটা। কেদার বদ্রীকে বললেন, তুই রথীনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বল। তার সঙ্গে একটু ইঙ্গিতও করে দিলেন। বদ্রী যা বোঝার বুঝে নিল। বদ্রীর মনে পড়ল কেদারদার সেই কথাটা। অপরাধী অনেক সময় অতিরিক্ত কনফিডেন্সে দুঃসাহস দেখিয়ে ফেলে, আর তাতেই ফেঁসে যায়। বদ্রীনারায়ণ নানা গুল্পগুজব আর কথাবার্তার মধ্যে এটুকু রথীনবাবুর কাছ থেকে জেনে নিল যে, বকুলরানির সম্পত্তিটা উনি পাবেন বলে স্থির নিশ্চিন্তই ছিলেন। বকুলরানিকে দেখভাল করার পেছনে তাঁর এই স্বার্থটা কাজ করেছে।

অ্যান্টিচেম্বারে তখন সান্যালবাবু আর কেদার মজুমদার সিরিয়াস আলোচনা করছিলেন। সান্যালবাবু এবার বেশ গম্ভীরভাবে, ধীরে ধীরে বললেন—

বুঝলেন কেদারবাবু, বকুলরানি আজ থেকে বছর দুয়েক আগে এক দুর্যোগের রাতে খুন হয়েছেন। এটা একমাত্র দেখেছিল বকুলরানির কাজের মেয়ে যমুনা মাহাতো। কিন্তু ভয়ে কোন দিন উচ্চারণ করতে পারেনি সে কথা। কিন্তু সেই গোপন কথা প্রকাশ না করা পর্যন্ত ওর শান্তি ছিল না। মনের আবেগ

চাপতে না পেরে সে রথীনবাবুকে হোটেলে পেয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেয়। ধীরেন ঘোষ দেখে ফেলেছিল সেই দৃশ্য।

কিন্তু ধীরেন ঘোষ দেখায় কী হয়েছে? কেদার মজুমদার বুঝতে পারছিলেন, তাঁর অঙ্কের সঙ্গে সবই মিলে যাচ্ছে এ পর্যন্ত। তুবও ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা করলেন।

সান্যালবাবু হেসে বললেন, আপনি প্রমাণ না পেলেও ঠিক অনুমানই করেছেন। হীরেন ঘোষের স্ত্রীকে উদ্ধার করেছেন আপনিই। ধীরেন ঘোষকে আমরা পিকচারে মধ্যেই আনতে পারিনি। সেও আপনিই এনেছেন। যাই হোক, সাবিত্রীদেবীর কথামতো আমরা হীরেন ঘোষকে আসানসোল থেকে তুলে নিয়ে এলাম পুরুলিয়ায়।

হীরেনবাবুকে জেরা করেছেন?

করেছি।

কোন তথ্য পাওয়া গেল?

বলছি, শুনুন। মাস দুয়েক আগে একদিন রাত একটা নাগাদ হীরেন ঘোষের ঘুম ভেঙে যায়। ধীরেন ঘোষ আর হীরেন ঘোষ একই পৈতৃক বাড়িতে সেপারেটভাবে থাকেন। ঘুম ভেঙে যেতে হীরেনবাবু বাথরুম যাচ্ছিলেন। বাথরুম যাবার প্যাসেজের লাগোয়া ধীরেন ঘোষের শোবার ঘর। যেতে যেতে ঘরের ভেতর দাদা-বৌদির কথাবার্তা শুনে কৌতূহলবশত হীরেনবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। কথাবার্তা শুনে হীরেনাবুর ফিট হয়ে যাবার মতো অবস্থা। ওরা দু-জন তখন যমুনা মাহাতোকে খুন করবার প্ল্যান করছিল। ওদের আলোচনার মূল থিম ছিল, একদিন প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে হীরেনবাবুর বৌদি রমা ঘোষ প্ল্যান মতো বকুল নীড়ে গিয়ে বকুলরানিকে ঘরের দরজা খুলতে অনুরোধ করে। বকুলরানি দরজা খোলামাত্রই ধীরেন ঘোষ ওই অপ্রকৃতিস্থ মহিলাকে গলা টিপে খুন করে। একই প্রক্রিয়ায় রমা ঘোষ যমুনা মাহাতোকে ডেকে রাস্তার ধারে নিয়ে আসবে। আর ধীরেন ঘোষ তাকে খুন করে খাদে ফেলে দেবে।

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়। তাই তো!

হ্যাঁ।

যেভাবেই হোক না কেন ধীরেন ঘোষ জানতে পারে, তার ভাই ব্যাপারটা জেনে গেছে। তখন সে ভাইকেও খুন করার প্ল্যান করে। হীরেনবাবু পালান। খাঁচায় আটকে যান হীরেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবী। তখন ধীরেন ঘোষ ভাইয়ের নামে চুরির অপবাদ দিয়ে থানায় ডায়েরি করে। এই তো! —এই বলে কেদার চুপ করলেন।

আরে! আপনি তো আমার থেকেও ভাল জেনেছেন ব্যাপারটা! স্যানালবাবুর এই কথার উত্তরে কেদার বললেন, আমি জানিনি। অনুমান করেছি শুধু। যার সাহায্যে আমার অনুমানগুলো পারফেক্ট হয়েছে বলতে পারেন, সে বদ্রীনারায়ণ। এই বলে কেদার থামলেন। চোখ বুজে এক মুহূর্ত কী ভেবে বললেন, মিস্টার সান্যাল! আমার মনে হয় আব এক মিনিটও দেরি করা উচিত নয়। ধীরেন ঘোষের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে মাত্র দু-জন কনস্টেবল। আমরা একটা সাঙ্ঘাতিক খুনী দলের মুখে পড়েছিলাম। সে অভিজ্ঞতা তো আপানারও হযেছে। ওদের কাছে এই দু-জন কনস্টেবল তো নস্যি। আপনি এবার খুনের অভিযোগে রমা ঘোষকে অ্যারেস্ট করে বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে আসুন। না হলে তৃতীয় খুনের টার্গেট হয়ে যাবে রমা ঘোষ।

তাই করা হল। সাধারণ লোক যাতে খুব একটা কৌতূহলী না হয়ে ওঠে, তাই রিকশায় করেই রমা ঘোষকে থানায় নিয়ে আসা হল। সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো, টানা চার ঘণ্টা ম্যারাথন জেরার চাপ সহ্য করতে পারল না রমা ঘোষ। বকুলরানি দত্তর খুনের ঘটনা সবটাই বলে ফেলল সে। টেপ রেকর্ডারে সমস্ত জবানবন্দি ধরে রাখা হল। এদিকে পুরুলিয়া কোর্ট থেকে হাজারো আইনের বাধা কাটিয়ে বকুলনীড়ের হস্তান্তর সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল। সান্যালবাবু বিকেল চারটে নাগাদ যখন পুরুলিয়া সদর থানায রেডিওগ্রাম করলেন, তখনও অনুসন্ধানকারী দু-জন কোর্ট থেকে ফেরেনি। সোয়া পাঁচটা নাগাদ পুরুলিয়া থেকে রেডিওগ্রাম এল। সান্যালবাবু ধরলেন।

হ্যালো! বড়বাবু? ওভার।

বল। কে বলছ? ওভার।

আমি সঞ্জীব মাহাতো বলছি স্যার। এইমাত্র কোর্ট থেকে ফিরলাম। ওভার।

জমির রেজিস্ট্রি রিপোর্ট পাওয়া গেছে? ওভার।

হ্যাঁ স্যার। এখানে দেখা যাচ্ছে, দু-বছর আগে বকুলনীড়ের জমিটা মনোরঞ্জন দত্ত সামান্য টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন বান্দোয়ানের অধিবাসী শ্রীধীরেন ঘোষকে। দলিল, জমির রেজিস্ট্রি সব পাকাপাকি হয়ে যাবার এক বছর পর ধীরেন ঘোষ ওই জমিটা আবার বিক্রি করে দেয়। ওভার।

কাকে বিক্রি করেছে? ওভার।

যাকে বিক্রি করেছে, তার নাম শ্রীদয়ারাম সিংহ। ব্যবসায়ী। যতটুকু জেনেছি, বিহারের ঘাটশিলা, জামশেদপুর, রাঁচি, এদিকে পুরুলিয়া, ঝালদা, বান্দোয়ান

জুড়ে ওর ব্যবসা। সব জায়গাতেই বাড়ি দোকান আছে। বেশিরভাগ সময় লোকটা ধানবাদে থাকে। ওভার!

জমিটা কত টাকায় বিক্রি হয়েছে পরের বার?

চার লক্ষ টাকায়। কোর্ট খরচ তার সঙ্গে ছাব্বিশ হাজার টাকা।

ব্যস! ঠিক আছে। ওভার।

মিস্টার সান্যাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। পাহাড়ি এই জনপদে সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেছে। দিনের সমস্ত আলো শোষণ করে নিয়ে সন্ধ্যা এগিয়ে আসছিল। ঈশান কোণে এক টুকরো কালো মেঘ তখন থেকেই যে ঘোরাঘুরি করছিল সেটা সবারই নজর এড়িয়ে গেছে। এমনিতে সারা আকাশ জুড়ে হালকা তুলো মেঘের ক্রমসঞ্চরমানতার ফাঁকফোঁকর দিয়ে দু-চারটে তারা দেখা যাচ্ছিল, যে তারাগুলো বরাবরই সন্ধ্যা আর রাতের সন্ধিক্ষণে ঝিক্‌মিক্ করে। ছোটনাগপুর মালভূমির এই অংশ একসময় বরাভূম নামে পরিচিত ছিল। পাশেই বিহারের সিংভূম জেলা। দূরে দিগন্তরেখায় অগুনতি পাহাড়ের শৃঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল জনপদে। তখনই বান্দোয়ান থানা থেকে একটা জিপে করে একদল সশস্ত্র মানুষ এক মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বতন বকুলনীড়ে গিয়ে হাজিল হল। এখন সন্ধ্যে ছ-টা। দোকানে-দোকানে বিদ্যুতের আলো। কেনা-বেচাও চলছিল। বকুল নীড়ের রাস্তার দিকের দোকানগুলোও খোলা। জিপ থেকে নেমে ওরা গেট দিয়ে নির্মীয়মাণ বাড়ির মধ্য দিয়ে ভেতরকার সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানে ঢুকে পড়ল। কেদার মজুমারের গলা পাওয়া গেল।

বলুন তো রমাদেবী, বকুলরানি দত্তের লাশটা কোথায় পুঁতে ফেলেছিলেন আপনারা?

ধীরেন ঘোষের স্ত্রী জাঁদরেল মহিলা রমা ঘোষকে আজ চেনা যাচ্ছিল না। যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। শীর্ণ মুখাবয়ব, কোটরাগত চোখ, মাথায় অজস্র সাদা চুল। খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটছিল সে। কাঁপতে কাঁপতে খানিকটা গিয়ে মহিলাটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পা আর চলে না। কেদার বললেন, চলুন। জায়গাটা দেখিয়ে দিন। যত দেরি করবেন, ততই আপনার ক্ষতি। মহিলা এবার আরো খানিকটা এগিয়ে গেল জমির পূব দিকের শেষ সীমায়। তারপর তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিল একটা জায়গা। কোদাল বেলচা রেডিই ছিল। সান্যালবাবুর হুকুমে দু-জন কনস্টেবল মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল।

রাত গভীর হতে এখনো দেরি আছে অনেক। আকাশে চাঁদ খানিকটা

পশ্চিমদিকে হেলে ছিল। সন্ধ্যাতারা তার নিজস্ব অবস্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ঈশান কোণের সেই কালো টুকরো মেঘটা এতক্ষণে আকাশের অনেকটা জায়গা কভার করে নিয়েছে। সন্ধ্যার উজ্জ্বল চাঁদ যতই রাত্রির দিকে এগোচ্ছিল, অপসৃয়মাণ মেঘের ভেতরে সে ততই পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করেছিল। চাঁদ আজ তার আপাদমস্তক ঔজ্জ্বল্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কালো মেঘের ছেঁড়া চাদরের তলায় নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। ঈশান কোণের কালো মেঘটা ক্রমশ : সমস্ত আকাশ জুড়ে তার থাবা বাড়িয়ে চলেছে। আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস তখন সকলেরই চোখ এড়িয়ে যাচ্ছিল।

বাজারে চার রাস্তার মোড়ে সকাল থেকেই শিফটিং ডিউটিতে সিভিল ড্রেসে পুলিস গাড়িগুলোর দিকে নজর রাখছিল। এখন রাত আটটা। পূর্বতন বকুলনীড়ের বাগানে যখন বকুলরানির কঙ্কালে বেলচার ঘা পড়ল, পাণ্ডুর চাঁদ আরও নিস্তেজ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল মেঘের অতলে। ঠিক তখনই একটা অন্ধকার-কালো রঙের জিপ এসে থামল চৌরাস্তার মোড়ে। কালো গায়ের রঙ, একজন গাট্টাগোট্টা চোয়াড় টাইপের লোক জিপ থেকে নেমে নিঃশব্দেই মুখোমুখি রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করল। ধীরেন ঘোষ। হ্যাঁ। বান্দোয়ান থানার সিভিল ড্রেসের পুলিস ওকে চিনতে পেরেছে। ধীরেন ঘোষ জিপ থেকে একশো গজের মতো দূরে চলে যাওয়া মাত্রই চারজন পুলিস জিপটার কাছে ছুটে এল। জিপে ড্রাইভারসহ চারজন লোক। চারজনই অবাঙালি। পুলিস চ্যালেঞ্জ করল ওদের।

তুমলোগ কৌন হো! উতারো! ইয়ে জিপ সার্চ করনে পড়েগা।

কোন উত্তর এল না। জিপের ভারী ইঞ্জিনটা গর্জে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিসটাকে সরাসরি ধাক্কা দিয়ে জিপটা দৌড় লাগাল। পড়ে যাওয়া কনস্টেবলটির ডান পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল জিপের পেছনের বাঁদিকের চাকা। ওর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল। আর্ত চিৎকারের পাশাপাশি আর এক কনস্টেবলের বন্দুক গর্জে উঠল চলমান জিপ লক্ষ্য করে। বন্দুকের গুলি জিপের ত্রিপলের কভার ফুটো করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু জিপ দূরন্তগতিতে ছুটল। মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে। বন্দুক হাতে কনস্টেবলটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আহত কনস্টেবলকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

বাড়ির দিকে যেতে যেতে ধীরেন ঘোষ পেছন ফিরে দেখল, এক মিনিটের মধ্যেই কি ঘটে গেল। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল। সিভিল ড্রেসের দু-জন পুলিস

আকস্মিক ঘটনায় মুহূর্তের জন্য হতচকিত হলেও ওদের সামনে ছিল শুধুমাত্র ধীরেন ঘোষ। অন্ধকারের দিকে অপসৃয়মাণ ধীরেন ঘোষের অবয়ব লক্ষ্য করে ওরা লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে এসে ধীরেন ঘোষকে জাপটে ধরল।

ধীরুবাবু! ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট!

ইয়ারকি করছেন না কি! কেন?

একজন পুলিস ধীরেন ঘোষের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল ঝটপট। এ সব লোককে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। পুলিস দু'টো মুখে কিছু বলল না। ওরা চিন্তিত। ওদের একজন গুরুতর আহত হয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

এদিকে বকুল নীড়ের বাগানে মৃতা বকুলরানির দেহাবশেষ মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। কঙ্কালটির বাঁ-হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছিল একটা চুনি বসানো আংটি। দেখেই চিনলেন রথীন সেন। তাঁর দিদি বকুলরানিই। দু-হাতে মুখ ঢেকে বাঁধভাঙা কান্নাকে আটকে রাখতে চাইলেন রথীনবাবু। তাঁর সর্বশেষ আপনজনটিও নেই।

দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ছিল। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল আকাশে। তক্ষুণি রাস্তায় ডিউটি দেওয়া দু-জন কনস্টেবল ছুটে এল বাগানে।

স্যার, স্যার!

কী হল?

একটা জিপ ধীরেন ঘোষকে নামিয়ে দিয়ে পালিয়েছে! আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। আমাদের সুবেদার সিংকে চাপা দিয়ে জিপটা পালালো! সুবেদার সাঙ্ঘাতিক ইনজিওর।

নম্বরটা নিয়েছ?

এত তাড়াতাড়ি পালালো! অন্ধকারে নাম্বার দেখাই যায়নি। আমরা ধীরেন ঘোষকে অ্যারেষ্ট করেছি।

গুড।

বদ্রীনারায়ণ খবরটা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ চমকালো, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। বদ্রী বলল, কেদারদা! এখানে সময় নষ্ট করো না। জিপটা পুরুলিয়ার দিকে গেছে। দেরি করো না। পুরুলিয়া যেতে হবে! এক্ষুণি ওই লোকগুলোই আছে। মনোরঞ্জন দত্ত ওদের সঙ্গে পালাবে! তাড়াতাড়ি করো!

মনোরঞ্জন দত্ত পালাবে? রথীন সেনের চোখে বিস্ময়।

কেদার আস্তে আস্তে উদাসীন ভঙ্গিতে নিজস্ব স্টাইলে বললেন,

হ্যাঁ। অঙ্ক অনুযায়ী তাই তো হবার কথা। বদ্রী, এই ভয়ঙ্কর লোকগুলো কিন্তু ব্যর্থতার জন্য হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

ঠিক তখনই পুবোদস্তুর বৃষ্টি নেমে গেল। আমি সেই ভয়ই করছি।

মুষলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মধ্যে পুলিসের জিপটা রাত ন-টা নাগাদ পুরুলিয়াব দিকে রওনা দিল। জিপের সামনে ড্রাইভারের পাশে গম্ভীর মুখে বসেছিলেন মিস্টার সান্যাল আর কেদার মজুমদার। ভেতরে বদ্রীনারায়ণ আর পাঁচজন সশস্ত্র কনস্টেবল। পেছনের সিটে হাতকড়া অবস্থায় ধীরেন ঘোষকে নিয়ে আরো দু-জন বন্দুকধারী কনস্টেবল। বৃষ্টি আর বিদ্যুতের ঝলকানির মধ্যে জিপ ছুটছিল, যতটা জোরে ছোটা যায়। বদ্রীনাবায়ণ ছটফট করছিল। ওর অবচেতন মন আর একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল। মাঝে বৃষ্টি একটু কমে এল। জিপ বরাবাজার পেরিয়ে দারুণ গতিতে ছুটল এবার। রাত্রির নৈঃশব্দ্য, ঘন অন্ধকারের মধ্যে ইঞ্জিনের গর্জন, আর সামনের হেডলাইট দু'টোর আলো—ছুটছে জিপ। বদ্রী বলল, এভাবে চললে কতক্ষণ লাগবে? সান্যালবাবু বললেন, প্রায় পাঁচঘণ্টা।

পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার আগে আর একটা জিপও ছুটছে। জান্তব মুখাবয়ব নিযে সেই জিপে বসেছিল তিনজন লোক। ড্রাইভারসহ চারজন। কারো মুখে কোন কথা নেই। একজনও সুস্থ সমাজের জীব নয়। ওদের কঠিন চোখে ছিল মৃত্যুর হিমঠাণ্ডা গন্ধ। কনস্টেবলের ছোঁড়া বন্দুকের গুলি এদের একজনের ঘাড়ের চামড়া ঘেঁষে চলে গেছে। ঘষটে যাওয়া চামড়ায় বারুদের গন্ধ। যন্ত্রণায় আর রাগে ওই লোকটাই শুধু গোঁ গোঁ করছিল।

প্ল্যান তো সব কুছ বরবাদ হো গিয়া!

হাঁ।

উসি কা সামনে সিরফ্ মওথ হি হ্যায়!

হাঁ। শালে!

ওদের চোখগুলো যেন মেরু অঞ্চলে হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে যাওয়া বরফ। ওরা বুঝেছে, লোকচক্ষুর আড়ালে ওরা যে নেটওয়ার্ক তৈরি করে ফেলেছিল, তা আর গোপন নেই। পুলিস সবটা না জানলেও সন্দেহের হলুদ ছায়া ওদের চোখে। এখন প্রত্যেকটিতে হানা দেবে পুলিস। কারণ ধীরেন ঘোষ পুলিসের হাতে। আর রিসক্ নেওয়া যাবে না। ওরা নিজেদের

আগ্নেয়াস্ত্রে মুঠি শক্ত করল। দলনেতা টাই্পের লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বলল—

ব্যস! খেল খতম্ হো গিয়া! দ্য এণ্ড। ইস ইলাকে সে ভাগনে পরেগা! ড্রাইভার জিপটাকে টপ গিয়ারে তুলে দিল। জিপ গোঁ গোঁ করে ছুটছে।

টপ গিয়ারে ছুটছে সান্যালবাবুর জিপ। বদ্রীর হাত-পা নিশপিশ করছিল। ও চাইছিল গাড়িটা উড়ে চলে যাক পুরুলিয়ায়। কিন্তু তা কী করে হবে! কেদার গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। কোন অঘটন না ঘটলে যেটা হতে যাচ্ছে, তা হল আর একটা খুন। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কেদারদা ভাবছিলেন, এক্ষেত্রে কীই বা করার আছে! ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশের নিচে পৃথিবী নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা ছিল। আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জিপ মাঝপথে বিহারের এলাকা পেরিয়ে এল। এবার বৃষ্টি নামল জোরে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আকাশ ফালা ফালা করা আলোয় পাথুরে জমি বহুদূর পর্যন্ত সাদা আলোয় ভরে যাচ্ছিল। বদ্রী ভাবছিল, আর কতদূর! সান্যালবাবু ভাবছিলেন, ঘটনা ক্রমেই জটিল হচ্ছে। ক্রিমিনালগুলো হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে! কেদার মজুমদার মনে মনে বলছিলেন, প্রত্যেকটা ঘটনাই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। কোন জটিলতা নেই। মনোরঞ্জন দত্তকে ধরতে পারলে বকুলরানি হত্যার সঠিক সমাধান হত। কিন্তু মনোরঞ্জন দত্ত আরো অনেক বড় অপরাধের দিকে পা বাড়িয়েছে। এর ফলাফল শুভ হবে কী করে!

কালো জিপটা রেলের লেভেল ক্রসিং পেরলো। বৃষ্টির মধ্যে দূরে পুরুলিয়া শহরের আলোগুলো আচ্ছন্নের মতো লাগছিল। জিপটা তখনও শহরে প্রান্তঃসীমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলছে। একটু ধীরে। সদর বাস টার্মিনাসের কাছে এসে জিপ গতি কমালো। তারপর বাঁ-দিকের রাস্তায় টার্ন নিয়ে ফের গতি বাড়াল। দুটো বড় রাস্তা ক্রস করে তৃতীয় রাস্তায় পড়ে এবার বাঁ-দিকে ঘুরল। মধ্য রাতে সদর শহরের এই এলাকাটা আধো-আলোকিত। নিস্তব্ধতার চাপ আরও জমাট বেঁধে রয়েছে মেঘবৃষ্টির জন্য। মুষলধাবে বৃষ্টির পর এখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। তাপমাত্রা বেশ কম। এই ঠাণ্ডায় সবাই অকাতরে ঘুমোচ্ছে। জিপটা এসে যেখানে থামল, তার সামনেই দত্ত ট্রেডার্স। জিপ থেকে একজন নামল। দোকানের ওপরটায় বিশাল অংশ জুড়ে সাইনবোর্ডে বিদ্যুতের আলোয় উজ্জ্বল লেখা—

দত্ত ট্রেডার্স
তামাকের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র

দোকানের পাশেই বাড়িতে ঢুকবার গেট। জিপ থেকে নেমে একজন একেবারে অলিম্পিক অ্যাথলেটিকের মতো দ্রুত আর আলতো পায়ে গেটের কাছে চলে এল। সামান্যতম শব্দও হল না। লোকটা গেটে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপল। জিপের মধ্যে তিনজন নিঃশব্দে বসেছিল। কলিংবেলের ক্র্যাং-ক্র্যাং আওয়াজ নৈঃশব্দ্যকে নাড়িয়ে দিল। কোন প্রত্যুত্তর নেই। আবার বেল টিপল লোকটা ক্র্যাং-ক্র্যাং! দোতলার ব্যালকনি থেকে একজন উঁকি দিল।

কে!

হাম।

কিসের জন্য ?

বাবুকো বুলাও।

আপলোক কৌন ?

বাবুকো বাতাও, হামলোগ দয়ানন্দ সিংকা আদমী।

এক মিনিট চুপচাপ। এই নীরবতার প্রতিটি সেকেন্ডকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। এবার দোতলার ব্যালকনিতে মনোরঞ্জন দত্তর ঘুম জড়ানো মুখ উঁকি দিল।

কে ?

হামলোগ।

ওঃ আচ্ছা।

আবার সব কিছু চুপচাপ। আকাশে ঘন কালো মেঘের আস্তরণ। মনোরঞ্জনবাবু সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। ওঁর চোখে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা।

এত রাতে।

থোরা বাতচিত থা।

ঠিক হ্যায়। অন্দর আইয়ে।

জিপ থেকে আরো দু-জন নামল। মাপা পা ফেলে ওরা বাড়ির গেটের

সামনে এল। গেটের সিঁড়িতে উঠল। মনোরঞ্জনবাবু আগে দু-পা এগিয়েছেন। মনোরঞ্জনবাবুর ঠিক পেছনের লোকটা পকেট থেকে রিভলভার বের করে মনোরঞ্জনবাবুর মাথা লক্ষ্য করে যেই মুহূর্তে ট্রিগার টিপল, সেই মুহূর্তেই জিপটা প্রচণ্ড শব্দে স্টার্ট করল। শুধু একটিমাত্র গুলি। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। মনোরঞ্জন দত্ত আর্ত চিৎকার করে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন শান বাঁধানো প্যাসেজটায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই রক্ত গড়াতে গড়াতে গেটের দিকে যেতে থাকল। মনোরঞ্জন দত্তর শরীরটা তখনও আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। ঘরঘর শব্দ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। ওরা তিনজন ততক্ষণে নির্বিকার মুখে গেট থেকে রাস্তায় নেমে জিপে গিয়ে বসল। একই রাস্তা ধরে জিপটা দারুণ জোরে ছুটে বাস টার্মিনাসের কাছে চলে এল। সেখান থেকে রাঁচি রোডে উঠেই উড়ন্ত গোলার মতো ছুটে চলল সামনের দিকে।

ঠিক সাত মিনিট বাদে সান্যালবাবুর পুলিস জিপ কেদার-বদ্রীদের নিয়ে বাস টার্মিনাসের কাছে চলে এল। কেদারবাবু বললেন— থানায় ইনফর্ম করে যান।

জিপ থানায় গিয়ে এক মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে সাড়ে চার মিনিটের মাথায় দত্ত ট্রেডার্সের সামনে এসে দাঁড়াল। সপসপে বর্ষায় ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছিল। গেটটা হা করে খোলা। সান্যালবাবুর হাতের টর্চটা গেটের ভেতরের প্যাসেজটায় ফোকাস করল। দেখা গেল মনোরঞ্জন দত্ত শান্তিতে শুয়ে আছেন নিজের শরীরেরই রক্তে মাখামাখি হয়ে। কিচ্ছু করা গেল না। কেদারের সেই স্বাভাবিক নির্বিকার ভঙ্গি। মৃত মনোরঞ্জন দত্তর দিকে তাকিয়ে উদাসীন ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বললেন,—

বকুলরানি হত্যা, যমুনা মাহাতো হত্যার মূল আসামি ইনি। এবং রথীন সেনকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন মনোরঞ্জনবাবুই। আমরা ওদের প্ল্যান সবই ভেস্তে দিয়েছি। ধীরেন ঘোষ অ্যারেস্ট হয়েছে। মনোরঞ্জনবাবু ধরা পড়লে একটা বিশাল চক্রের অনেক গোপনীয় কাজকর্ম বেরিয়ে পড়ত। মনোরঞ্জনবাবুর মৃত্যু তাই অবধারিত ছিল।

শুনে সান্যালবাবুর চোখদুটো গোল গোল হয়ে গেল।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো।

আজকে আর নয়। আজকের রাতটুকু ঘুমবো! দুঃখ একটাই। তৃতীয় খুনটা আটকাতে পারলাম না।

এদিকে বিরাট ফোর্স নিয়ে আরও দুটো পুলিস জিপ এসে থামল।

হলুদ বাড়িতে উপসংহার

আজকের সন্ধ্যের আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে কেদার-বদ্রী জুটি ফিরে যাবে কলকাতায়। রিজার্ভেশনও হয়ে গেছে। রথীন সেন সকালেই বান্দোয়ান থেকে পুরুলিয়া ফিরেছেন। রথীনবাবুর বাড়িতেই ওরা দু-জন লাঞ্চ খাচ্ছে। মিস্টার সান্যালও নিমন্ত্রিত। বাংলাদেশের ইলিশ এখানেও হাজির। ইলিশের কাঁটা বাছতে বাছতে কেদার মজুমদার কথা বলছিলেন।

আমি যেটুকু জেনেছি, তাতে দেখছি, বছর দুয়েক আগেও মনোরঞ্জন দত্তর ব্যবসা এত রমরমা ছিল না। বছরখানেক হল খুব ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আন্তঃরাজ্য ব্যবসা চালাচ্ছিলেন উনি। জামশেদপুর-রাঁচি-ধানবাদ অঞ্চলের মাফিয়া লিডার হিসাবে দয়ানন্দ সিংয়ের নাম আমি কলকাতা পুলিসের কাছেই শুনেছি। টাকার লোভেই মনোরঞ্জন দত্ত ধীরেন ঘোষকে দিয়ে বকুলরানিকে খুন করায়। রথীনবাবুকে বঞ্চিত করতে বকুলরানির উইল হাপিস করে দেয়। প্রথমে ধীরেন ঘোষের কাছে নামমাত্র দামে বকুল নীড় বেচে দেয়। তারপর ধীরেন ঘোষকে দিয়ে চার লাখ টাকায় বকুল নীড় বিক্রি করে দয়ানন্দ সিংয়ের কাছে।

তাহলে গোয়েন্দা দিয়ে তদন্ত করার রথীনবাবুর প্রোপোজাল মনোরঞ্জন দত্ত মেনে নিল কেন? সান্যাল প্রশ্ন করলেন।

ওভার কনফিডেন্স। দয়ানন্দ সিংয়ের ডেঞ্জারাস মাফিয়া গ্রুপের ওপর ওঁর পুরো আস্থা ছিল। প্রথমদিন রথীনবাবুর এই বাড়িতে ওদের নিখুঁত এবং দক্ষ কাজ দেখেই আমি আর বদ্রী অনুমান করেছিলাম, হয় এরা উগ্রপন্থী, না হয় মাফিয়া গ্রুপ।

এবার বদ্রী বলল, মনোরঞ্জনবাবু নিজেকে দারুণ বুদ্ধিমান মনে করতেন। প্রথমদিন ওর স্ট্রেইট কথাবার্তায় আমিও ওঁকে সন্দেহ করতে পারিনি। ধীরেন ঘোষের তামাকের ব্যবসা আর ধীরেন ঘোষের ঘরের বারান্দায় একটা ছবি—

যে ছবির লোকটাকে আমি মনোরঞ্জন দত্তর তামাকের আড়তে সন্দেহজনকভাবে চেয়ে থাকতে দেখেছিলাম প্রথমদিন। ছবিটা ধীরেন ঘোষেরই। সন্দেহ শুরু তখন থেকেই। আর রথীনবাবু সন্দেহ করেছিলেন গোড়াতেই। তাই না রথীনবাবু? কেদার প্রশ্ন করলেন।

রথীন সেনের মনটা খুবই খারাপ। চোখ-মুখ ভার-ভার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলছিলেন। জামাইবাবুর ব্যবসাটা খুবই পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ লরি

লরি তামাকের লেনদেন শুরু হয়ে গেল! তাছাড়া যমুনা মাহাতো হোটেলে সেদিন আমাকে বলেছিল, 'দত্তবাবু আর ধীরুবাবু ভারি বন্ধু হইঞ্ছে।'

কিন্তু এই কথাটা রথীনবাবু আমাদের বলেননি। কারণ, মনোরঞ্জন দত্ত এমন ওভার কনফিডেন্সে কথা বলেছে, যে তাকে সন্দেহ করেও করেননি রথীনবাবু।

ঠিকই বলেছেন।

মনোরঞ্জন দত্তকে ওরা খুন করল কেন?

মাফিয়ারা বকুল নীড়ের জন্য চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করেছে। কলম্বিয়ায় যেমন ফুটবল লিগ মাফিয়ারা চালায়, যার জন্য বিশ্বকাপ ফুটবলার এসকোবার খুন হল। এখানে, বিশেষ করে বিহারে বিগ বিগ বিজনেস মাফিয়াদের হাতে। দয়ানন্দ সিংয়ের গ্রুপ পুরুলিয়াকে নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যে ঢোকাতে চাইছিল। কিন্তু প্রথমেই ধাক্কা। বকুল নীড় নিয়ে পুলিস এবার জলঘোলা করবেই। মনোরঞ্জনবাবু পুলিসের খপ্পরে পড়লে মাফিয়া-নেটওয়ার্কের অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ত।

এ জন্য ওরা মনোরঞ্জনবাবুকে মেরে দিল?

আমার অনুমান তাই। যাই হোক। ধীরেন ঘোষ আর ওর স্ত্রী রমা ঘোষ—দু-জনই বকুলরানি ও যমুনা মাহাতোর খুনের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের কাজ ছিল বকুলরানি-সমস্যার সমাধান করা। এরপর যদি তদন্ত চালিয়ে কোন রাঘব-বোয়ালকে ধরতে পারেন সে আপনাদের কৃতিত্ব।

রথীন সেন তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবছিলেন, আমার আর রইল কে? রাঁচি রোড দিয়ে গাড়ির আসা-যাওয়া চলছে অনবরত। রথীন সেনের মনের মধ্যে তখন জলপ্রপাত। একজন নিঃসঙ্গ মানুষ এবার জীবনটাকে অতিকষ্টে বয়ে নিয়ে বেড়াবেন।

সন্ধ্যার ট্রেনে কেদার-বদ্রী জুটি কলকাতা রওনা দিল। টেন চলে যাবার পরও বহুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন রথীন সেন।

পঁচিশে বৈশাখ বদ্রীনারায়ণ একবার রবীন্দ্র সদন যাবেই। এমন দিনে, সত্যি কথা বলতে কি, ঘরে বসে থাকার কোন মানেই হয় না। আজকের দিনটা ওর ভারী পবিত্র মনে হয়। যেন রোজকার হট্টগোলের মাঝখানে শান্ত এক দ্বীপ। বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীরা সব রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন আজকে। এমন একটা অনুষ্ঠান মিস্ করে কেউ! কেদার মজুমদারকে ও গতকালই বলে রেখেছিলো, কেদারদা, কাল ভোরে উঠেই রবীন্দ্রসদন যাবো।

কেন ?

কাল পঁচিশে বৈশাখ। জানো না ?

তাইতো! তালেগোলে সব ভুলে গেছি। তা তুই জোড়াসাঁকো না গিয়ে রবীন্দ্রসদন যাবি কেন ? জোড়াসাঁকোইতো তোর কাছে হবে!

কি যে বলো! ভোরে ময়দান চত্বরের মেজাজই আলাদা। সবুজ ঘাস বিছানো মাঠের যে কোন জায়গায় বসে পড়লেই হলো। তারপর শুধু মিষ্টি হাওয়া, গান আর আবৃত্তি। বলতে বলতে বদ্রীর চোখ দু'টো মায়াময় হয়ে গেলো। কেদার দেখলেন, বদ্রীর নীল চোখ দু'টোয় এক ধরনের অপার্থিব আলো। ওর চোখের মণির নীল বিন্দুটা যেন দূর কোন গ্রহের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করতে চাইছে। কেদার বদ্রীকে খুব ভালোভাবেই বোঝেন। বদ্রী যখন গভীর কোন ভাবনায় ডুব দেয়, মনে হয় ও যেন এক অতলান্ত সীমাহীন কোন অজানা জগতে চলে গেছে। নিজের পারিপার্শ্বিক থেকে বদ্রী তখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেদার বদ্রীনারায়ণের সেই অবস্থাটাই দেখতে পেয়েছিলেন গতকাল। কেদার যেমন খুবই আধুনিক কবিতার ভক্ত, বদ্রী তেমনই আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। অবশ্য রহস্যের জট ছাড়াতে কেদার গোয়েন্দার ফিফ্‌টি পার্সেন্ট কাজ বদ্রী এগিয়ে রাখে সবসময়ই। সেটা ওর গভীর অনুভূতির ব্যাপার। সেটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। ধরতেও পারে না। বদ্রীর তীব্র অনুভূতি আর নীল দু'চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে বাঘা বাঘা অপরাধীরা অপরাধ স্বীকার করে ফেলে। আশ্চর্য রহস্য এখানটাতেই! কি সেই রহস্য আশ্চর্য দু'চোখে ? যার সামনে কোন জটিলতা আড়াল হয়ে

দাঁড়ায় না! যাক সে কথা। ঘটনা যখন ক্রমশঃ এগিয়ে যাবে, আমরা তা দেখতেই পাবো। তবে আজ পঁচিশে বৈশাখ। বদ্রীনারায়ণ তাই পুরো অন্য মুডে আছে।

আজ ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ বদ্রী ঘুম থেকে উঠেছে। ওদের ক্যারাটে ক্লাবে প্র্যাকটিস শুরু হয় ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে। এখনো ছেলেপুলেরা আসেনি। বদ্রী আর কেদারকে ডাকলো না। ঘর থেকে বেরিয়ে প্র্যাকটিস গ্রাউণ্ডে নেমে মিনিট দশেক ফ্রি হ্যাণ্ড এক্‌সারসাইজ করে নিলো। ঘুমশরীরের জট ছাড়িয়েই বদ্রী ভাবলো, চানটা সেরে নিই। কখন আসবো কে জানে! তখন অবেলায় চান করে আবার শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন? চানটান করে মিনিট কুড়ির মধ্যেই জামাপ্যান্ট পরে বদ্রীনারায়ণ একেবারে ফিট। এবার ও কেদারকে ঠেলে তুলে দিয়ে বললো, আমি যাচ্ছি!

কোথায়?

রবীন্দ্র সদনে।

ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। এ-কথা বলেই কেদার ঘুমজড়ানো চোখে পাশ ফিরে শুলো, এবং যথারীতি ঘুমিয়ে পড়লো।

বদ্রী রাস্তায় বেরিয়ে দেখলো, গোপালের চায়ের দোকান খুলে গেছে। দু'জন মাত্র খদ্দের বসে আছে বেঞ্চিতে। বদ্রী গিয়ে বেঞ্চিতে বসেই হাঁক পাড়লো—

গোপালদা, ঝট করে একটা ডবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে দাও! আর কোয়ার্টার রুটি একটা সেঁকে দাও।

দিচ্ছি। বদ্রী ভাই, এত ভোরে যাচ্ছ কোথায়?

একটু রবীন্দ্র সদন যাবো।

বদ্রী বেঞ্চে বসে গোপালদার ওমলেট তৈরি দেখছিলো। উনুনের ওপর কেটলিতে চায়ের জল ফুটছে। শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে। ভোরের কলকাতা একটু একটু করে জাগছে। কর্পোরেশনের মেথররা রাস্তা পরিষ্কার করছে। পানের দোকানের ভজুয়া রাস্তার কলে বালতি বসিয়েছে। বদ্রীর চোখ এই সব কিছুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। এইসব দেখতে দেখতে বদ্রী একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিলো। এই অন্যমনস্ক সময়টুকুর মধ্যে ওর অবচেতনে একটা বিপদের গন্ধ ধরা পড়ছিলো। বদ্রীর নার্ভগুলো তখনই সতর্কতায় টান টান হয়ে উঠলো।

এই যে রুটি, ওমলেট! গোপালদার কথায় বদ্রী সম্বিৎ ফিরে পেলো। বদ্রী খেতে খেতে দেখলো, সামনের দু'টো বাড়ির ফাঁক দিয়ে এক চিলতে হালকা রোদ রাস্তার ওপর পড়েছে। বেশ বেলা হয়ে গেলো—বদ্রী মনে

মনে বললো। তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলো বদ্রী। ঝটপট খেয়ে পয়সা মিটিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউতে রাজবল্লভপাড়া বাস স্ট্যান্ডে এসেই ও একটা মিনিবাস পেয়ে গেলো। তারপর সোজা রবীন্দ্রসদন।

নন্দন ফিল্ম কমপ্লেক্স, বাংলা আকাদেমি, আকাদেমি অব ফাইন আর্টস আর রবীন্দ্র সদনের মাঠ সবটাই বিশ্বকবিময়। রবীন্দ্রগানের ভক্ত যাঁরা, আজকের দিনটা পুরো উপভোগ করতে চান সবাই-ই। ছাত্র-ছাত্রীরা এসেছে। বন্ধুরা মিলে অনেকে এসেছে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা ঘুরে ঘুরে তাঁদের পত্রিকা বিক্রি করছেন। অনেকে কবিতার বইও বিক্রি করছেন। বদ্রীর খুব ভালো লাগছিলো। ত্রিপল দিয়ে বিশাল মণ্ডপ করা হয়েছে। সেখানে রবীন্দ্র স্মরণে বড় বড় শিল্পীরা গান গাইবেন। আবৃত্তি করবেন। রবীন্দ্র রচনা পাঠ করবেন। মাইকে তখন গান ভেসে আসছিলো। বদ্রী আর তাবু ঘেরা মণ্ডপে ঢুকলো না। রাস্তা থেকে উঠে এলো রবীন্দ্রসদন চত্বরের ভেতরে। তারপর ডানদিকে ফুলগাছের কেয়ারি করা সবুজ ঘাসের বাগানে ঢুকে রুমাল পেতে বসে পড়লো। বহু ছেলেমেয়ে বসে আছে এখানে। মাইকে গান ভেসে আসছিলো— 'জাগরণে যায় বিভাবরী'....। এমন দিন, এমন পরিবেশ আর এমন গান যার কপালে জুটলো না, সে বড় দুর্ভাগা। বদ্রী ভাবছিল। বদ্রী ভাবছিলো, আর গান শুনছিলো। গান শুনতে শুনতে ও হারিয়ে যাচ্ছিলো সেই সীমানাহীন জগতে, যা ওকে সবসময় টেনে ধরতে চায়। বদ্রী কি নিজে সেই ব্যাপারটা বোঝে? না, এই সমস্যার সমাধান আজো হয়নি। দারুণ এক আশ্চর্য চরিত্রের ছেলে এই বদ্রীনারায়ণ। ওর চোখ দু'টো নীল। বিড়ালচোখ। সেই চোখে কি যে রহস্য খেলে বেড়ায়, তা বোঝা বড় মুশকিল! কোন বিষয়, কোন জটিল পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বসলেই ওর ওই দু'চোখে ভিন্ন গ্রহের আলো এসে খেলা করে। ওর অবচেতন মন যেন ছুটে চলে যায় এই সৌরজগৎ পার হয়ে কোন নীহারিকালোকে। ওর সমস্ত সত্তা কোন গভীরে ডুব দেয়, কে জানে! কিন্তু গোয়েন্দা কেদার মজুমদার যখন কোন কেসের জটিল গ্রন্থিগুলোর জট কিছুতেই ছাড়াতে পারেন না, বদ্রী তখন সেই জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসে। ডুবে যায় গভীরে। যেন অন্য কোন গ্রহে চলে গেছে ওর মন। ওর তৃতীয় চক্ষু খুলে যায়। সব রহস্য তখন ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। কেদার মজুমদারের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন গোয়েন্দার সহকারি হিসাবে বদ্রীনারায়ণের এই মানসিক ক্ষমতা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে গেছে।

আজ এই সকালে রবীন্দ্রসদনে শুধু পঁচিশে বৈশাখেরই গান। চোখ বুজে

গান শুনতে শুনতে বদ্রীর অবচেতন মন যে কখন ভিন্ন গ্রহে পাড়ি দিয়েছিলো, তার খবর কেউ রাখেনি। রাখার কথাও না। বদ্রীর নীল চোখ দু'টোয় তখন নীল ঘূর্ণি। এই এখন ওর নীল চোখের মণি দু'টোর দিকে যদি কেউ তার দু'চোখ রাখতো, তবে দেখতে পেতো, সে দু'টো চোখের আকাশনীল মণি যেন কোন উপগ্রহের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। আর বদ্রীর মনের মধ্যে কি হচ্ছিলো এখন? অবাক হবারই কথা বটে! রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঝরণাতলায় বসে ও হারিয়ে যাচ্ছিলো কোন নক্ষত্রলোকের কিনারায়।

হ্যাঁ, বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি এখন এই রবীন্দ্রসদনের ঘাসে ঢাকা চত্বরে বসে থেকেও বসে নেই। ওর মন, ওর সমস্ত সত্তা চলে গেছে অদ্ভুত এক দেশে। বদ্রী শুনতে পাচ্ছিলো, নদীর জলের কলকল শব্দ। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলো সেই শব্দটা। ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো একটা কৃষ্ণমূর্তি। মূর্তিটা যে বেদীর ওপর বসানো, সেটা সাদা রঙের। ওর কানে এলো হাতির ডাক। ওর মনে হচ্ছিলো, দলমা পাহাড় থেকে একদল হাতি বেরিয়ে এসে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে। তাদের শুঁড়ের দু'পাশে ঝকঝক করে উঠছে সাদা দাঁতদু'টো। সেই সাদা দাঁতের রঙের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিলো কৃষ্ণমূর্তি রাখা বেদীটার রঙ। অদ্ভুত, অসম্ভব সাযুজ্যহীন এইসব ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি বদ্রীনারায়ণের অবচেতনায়, ওর তৃতীয় চক্ষুর সামনে ভেসে উঠছিলো। যেন কোন ডকুমেন্টারি ফিল্মের প্রজেক্শন চলছে ওর সামনে। এরপরই সব ঝাপসা হয়ে গেলো। কে যেন ওকে ডাকছে! অনেকদূর থেকে সেই ডাক ভেসে আসছিলো। বদ্রী কান খাড়া করলো। বদ্রী কোলাহল শুনতে পাচ্ছিলো। গানের আওয়াজ। ডাকটা এবার খুব কাছে।

বদ্রীনারায়ণ না! এই বদ্রী! গান শুনতে শুনতে দেখছি একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গেছো!

বদ্রী দ্রুত চেতনায় ফিরে এলো। আশ্চর্য! কি সব দেখছিলাম আমি? ভাবতেই ওর গা'টা শিউড়ে উঠলো। ধাতস্থ হয়ে ও দেখলো, সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দৈনিক যুগবার্তা পত্রিকার নিউজ এডিটর ভাস্কর ব্যানার্জি।

আরে, তোমাকে আমি ওই গেট থেকে হাত দেখাচ্ছি! ডাকছি। শুনতেই পাচ্ছো না! এতো অন্যমনস্ক!

বদ্রী ওর স্বভাবসুলভ হাসি হেসে বললো, বলুন, কেমন আছেন?

কেদারবাবুর খবর কি? তোমাদের গোয়েন্দাগিরির রোমাঞ্চকর খবরটবর দাও!

সে তো কেদারদার ব্যাপার।

কেদারবাবুকে তো আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেইজন্যই তোমাকে দেখে ছুটে এলাম।

কিসের জন্য ?

আরে ভাই, কাজ আছে, কাজ। তোমাদের হাতে যদি কোন কেস না থাকে, তবে কালই যুগবার্তার অফিসে কেদারবাবুকে একবার আসতে বলো।

আচ্ছা, বলে দেবো।

ঠিক আছে। তা'হলে চললাম ভাই। বেশ রোদ উঠেছে। পঁচিশে বৈশাখ এখানে না এসে পারিও না। তবুও যা হোক, মেট্রো রেলটা হওয়ায় ঝট করে বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি। বলেই ভাস্করবাবু নন্দন কমপ্লেক্সের দিকে হাঁটা দিলেন।

বদ্রীনারায়ণ ভাস্কর ব্যানার্জির চলে যাওয়া দেখছিলো। বেঁটেখাটো মানুষটা। একটা ঢিলেঢালা স্টোনওয়াশ জিনস্ আর নীল গেঞ্জিতে বেশ স্মার্টই লাগছিলো ভাস্করবাবুকে। মাথাভর্তি চুল ব্যাকব্রাশ করা। হাঁটবার ভঙ্গিতে সাহেবীয়ানা আছে। প্রত্যেকটা মানুষকে খুঁটিয়ে দেখবার অভ্যেস বদ্রীনারায়ণের। ভাস্করবাবু ডানদিকে মোড় নিয়ে বদ্রীর আড়ালে চলে গেলেন। বদ্রী ভাবছিলো, ভাস্করবাবু লোকটা ভারী মজার। সিরিয়াস বিষয়ও বলেন হালকা চালে। তবে একটু লোকদেখানো ভাব আছে ওনার মধ্যে। যাকগে, কেদারদাকে বলতে হবে, ভাস্করবাবু যেতে বলেছে।

ভাস্করবাবুর অফিসে যাওয়ার কথাটা মনে হওয়া মাত্রই একটা বিদ্যুৎঝলক খেলে গেলো বদ্রীর মস্তিষ্কে। বহুদূরের ভিন্ন কোন গ্রহ থেকে মনে হলো যেন, কেউ সঙ্কেতে বলছে, বদ্রী সাবধান! সামনে বিপদ! বদ্রী ফের কেঁপে উঠলো অজানা আশঙ্কায়।

দিন সাতেকের অ্যাসাইনমেন্ট

হ্যালো!

হ্যালো! নমস্কার। যুগবার্তা পত্রিকা। কাকে চাইছেন ?

নিউজ এডিটর ভাস্কর ব্যানার্জি আছেন ?

আপনি কে বলছেন ?

বলুন, কেদার মজুমদার কথা বলবে। প্রাইভেট ডিটেক্টিভ।

আরে কেদারবাবু নাকি! আমি রিশেপসনের মন্দিরা বলছি। কেমন আছেন ?

ভালো। ভাস্কর আছে?

আছে। লাইনটা ধরুন। ভাস্করদার ঘরে দিয়ে দিচ্ছি।

কেদারকে যুগবার্তা পত্রিকা অফিসের অনেকেই চেনে। ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার হিসাবে কেদার মজুমদার যুগবার্তার কিছু কিছু কাজ করেও দিয়েছেন। জার্নালিজমের ওপর কেদারের দারুণ টান। নিজের গোয়েন্দাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যুগবার্তায় ছোটদের জন্য তিনি কয়েকটা রোমাঞ্চকাহিনীও লিখে দিয়েছেন। সব মিলে দৈনিক যুগবার্তায় কেদার মুজমদার বেশ পপুলার। —এবার ফোনে ভাস্করের গলা শুনতে পেলো কেদার।

হ্যালো, কেদার নাকি?

হ্যাঁ। খুঁজছিলে কেন?

আরে দরকার আছে। হাতে জরুরী কোন কাজ না থাকলে চলে এসো।

কি দরকার সেটা বলো!

চলেই এসো না! সব কথা কি আর টেলিফোনে বলা যায় নাকি!

ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো, ঘন্টাখানেকের মধ্যেই যাচ্ছি।

ও কে।

এখন বাজে বিকেল চারটে। উদিতভানু ইনফরমেশনে এখন বদ্রী নেই। ও গেছে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরিতে বই আনতে। টেলিফোনের কাজ সেরে কেদার ক্লাবের দারোয়ান দিলাবর সিংকে ডাকলো।

দিলাবর!

জী বাবু।

আমি একটু বেরুচ্ছি। বদ্রীকে বলে দিও।

জী।

দিলাবরের মুড ভালো থাকলে ঠিক আছে। মুড খারাপ থাকলেই মুশকিল। কোথায় যাচ্ছো, কেন যাচ্ছো, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে এতক্ষণ কেদারকে জেরবার করে দিতো। কেদার আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে গেলো এ জে সি বোস রোডে দৈনিক যুগবার্তার অফিসে।

ভাস্কর ব্যানার্জি নিজের ঘরেই ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন কেদারের আসার জন্য। কেদার আসামাত্রই বেয়ারাকে দু'টো কোল্ড ড্রিংকস্ আনতে বলে কেদারের সঙ্গে জরুরী কথা শুরু করলেন।

শোনো, তোমাকে দিন সাতেকের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাইছি। প্রবলেম নেই তো?

নো প্রবলেম। কেদার উৎসাহী হয়ে উঠলো। কোথায় যেতে বলছো?

মুন্সিগঞ্জে। খুব খরা চলছে ওখানে। সবটা ঘুরে খুঁটিয়ে দেখে ধারাবাহিক ফিচার লিখতে হবে।

ফাইন! কবে যেতে হবে?

আজ পারলে আজই। গুছিয়ে বেরিয়ে পড়তে যেটুকু সময় লাগে।

ঠিক আছে। কালকে সন্ধ্যের ট্রেন ধরবো। বদ্রীও যাবে আমার সঙ্গে।

বেয়ারা ততক্ষণে কোল্ড ড্রিংকস্ দিয়ে গেছে। স্ট্র-তে ঠোঁট রেখে দুই বন্ধু এবার গল্পগাছা শুরু করলো।

মধ্য রাতে কারা কথা বলে?

ট্রেন যখন মুন্সিগঞ্জে এসে পৌঁছলো, তখন রাত পৌনে ন'টা। কেদার মজুমদার প্লাটফর্মে নামলেন। পেছন পেছন নামলো বদ্রী। দু'জনের হাতেই একটা করে হালকা ব্যাগ। স্টেশন প্লাটফর্মটা একেবারে থমথমে। ওরা দু'জন ছাড়া আর মাত্র একজন ট্রেন থেকে নেমেছে। এক ধরনের সর্পিল হিসহিসে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিলো বদ্রীদের মাথার ওপর দিয়ে। বদ্রী সেই হাওয়ায় কান পাতলো। দিনের বেলা বৈশাখের তীব্র খরতাপের পর রাতের বাতাসে আরাম আছে। সেই আরাম ছাপিয়েও সেই হাওয়ায় বদ্রী অন্যরকম গন্ধ পেলো। কী সেই গন্ধ? সেটা বদ্রী ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না।

কেদার লক্ষ্য করছিলেন, স্টেশনে ইলেকট্রিকের আলো আছে ঠিকই, তবে তার বেশিরভাগই জ্বলছে না। টিকিটঘরের সামনের ল্যাম্পপোষ্টে একটা ভেপার ল্যাম্প জ্বলছে। সেই আলোই প্লাটফর্মের মাঝখানটুকু আলোকিত করতে পেরেছে। দু'নম্বর প্লাটফর্মে মোট তিনটে আলো জ্বলছে টিমটিম করে। কেদার এতক্ষণে কথা বললেন।

বদ্রী, ইলেকট্রিকের আলোগুলো দেখেছিস? কেরোসিন ল্যাম্পও এর চেয়ে বেশি আলো দেয়।

যা বলেছো। ভোল্টেজ এক্কেবারে লো হয়ে আছে।

যাকগে। চ, স্টেশন মাস্টারের ঘরে তো যাই!

প্লাটফর্মের মাথা থেকে ওরা দু'জন স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে হাঁটা দিলো। প্লাটফর্মের ওপরে বকুল আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া জায়গাটাকে ভৌতিক করে তুলেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডেকে চলেছে একটানা। রাতপাখির ডাক আর ডানা

ঝটপটানির শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। কেউ যেন শিষ দিয়ে উঠলো। বদ্রী দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করলো। ওর নীলরঙা বিড়ালচোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। ততক্ষণে কেদারও দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিছু কি শোনা গেলো? অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো বদ্রী। কিছু কি দেখা গেলো? এ-রকম গা ছমছমে ভাব লাগছে কেন? বদ্রী ভাবছিলো। কিন্তু কোন কিছুর হদিশ পাওয়া গেলো না। বদ্রীর অন্তর্ভেদী চাহনী গাঢ় অন্ধকারেও জ্বলে ওঠে। ও সব দেখতে পায়। তেমন কিছু এখনো বদ্রীর নজরে পড়লো না। কিন্তু একটা সন্দেহের কাঁটা বদ্রীর মনে খচ্‌খচ্‌ করতেই থাকলো। এবার কথা বললো বদ্রী।

চলো কেদারদা! স্টেশন মাস্টারের ঘরেই চলো।

তাই চল্‌। শুরুতেই আজকে থমথমে পরিস্থিতি। শেষটা কেমন হবে কে জানে!

দেখা গেলো, স্টেশন মাস্টার টেলিফোনে কথা বলছেন। বোঝা গেলো, বদ্রীরা যেই ট্রেনে এলো, সেই আপ ট্রেনটা পরের স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছে। শেষ ডাউন ট্রেনের খবর নিচ্ছিলেন স্টেশন মাস্টার। এবার উনি রিসিভারটা ক্রেডেলে নামিয়ে রাখলেন। আবার নিস্তব্ধতা। শুধু মাথার ওপর দু'টো ফ্যান শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরে চলেছে।

নমস্কার!

স্টেশন মাস্টার চমকে পেছনে তাকালেন। দেখলেন, দুই মূর্তিমান পেছনে দাঁড়িয়ে।

আমার নাম কেদার মজুমদার। এর নাম বদ্রীনারায়ণ মুখার্জি। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। এই ট্রেনে নামলাম।

প্রৌঢ় স্টেশন মাস্টার তাঁর চশমাটা নাকের সামনে আর একটু নামিয়ে এনে এদের দু'জনকে খুঁটিয়ে দেখে নিলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, বলুন, কি চাই?

আসলে আমরা এসেছি দৈনিক যুগবার্তা খবরের কাগজ থেকে। এখানকার খরা পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট করবো। বদ্রী বললো, হ্যাঁ। যাতে মুন্সিগঞ্জের এই ভয়াবহ খরার দিকে সরকারের নজর পড়ে, সেইজন্যই লেখালিখি করতে হবে। আমি হচ্ছি ফটোগ্রাফার।

ও আচ্ছা। ভালো ভালো। কিন্তু এতো রাতে—

সেই জন্যই তো আপনার কাছে এলাম। ট্রেন তো চারঘন্টা লেটে মুন্সিগঞ্জে ঢুকলো। আমাদের তো বিকেল পাঁচটা নাগাদ এখানে পৌঁছনোর কথা। দেখুন তো কি করি! রাত সোয়া ন'টা হয়ে গেলো। এখন কোথায়ই বা যাবো!

তাই তো! তা আপনাদের কোথায় ওঠবার কথা ছিলো?

লস্করপুর ফরেস্টের সরকারি গেস্ট হাউসে।

ওরে বাবা! সেতো এখান থেকে পাঁচ মাইল! এখন রিকশা পাবেন না। টাঙা পেলে পেতে পারেন। কিন্তু এত রাতে গেস্ট হাউসের দারোয়ানকে কি খুঁজে পাবেন?

মহা ফ্যাসাদে পড়লাম দাদা। এই স্টেশনে কি কোন ওয়েটিং রুম নেই?

আছে। স্টেশনের নিচে। ওটায় কেউ বসে না। কেউ থাকেও না। বন্ধই থাকে। দাঁড়ান দেখছি। কি করা যায়!

আপনার নামটা তো জানা হলো না স্যার!

আমার নাম অমলকৃষ্ণ মিত্র। —বলে স্টেশন মাস্টার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে হাঁক পাড়লেন, আরে ও ভজু! ভজুয়া! শুনছিস!

কিন্তু এত ডাকেও ভজুয়া নামক কারুর কোন সাড়া পাওয়া গেলো না। বদ্রী দেখছিলো, চারদিক ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছিলো। স্টেশনের পাশের গ্রামগুলো নিবিড় গাছপালার জমাট অন্ধকারে ঘুমের মধ্যে ডুবে আছে। প্লাটফর্মের পূবদিকে শেষ মাথায় কেবিন ঘরে আলো জ্বলছে। দূরে সিগন্যালের সব আলোই লাল। এই মুহূর্তে কোন গাড়ি আসছে না।

ভজুয়া! আরে এই ভজুয়া! নাইট ডিউটি থাকলে ব্যাটারা আরো বেশি ঘুমোয়।

অমলবাবু আবার হাঁক পাড়লেন, আরে এই ভজুয়া! মরলি নাকি অ্যাঁ!

আয়াথানি হো বাবু-উ-উ-উ-উ-উ! আয়াথানি। —দেখা গেলো, কেবিনঘরের সিঁড়ি দিয়ে একটা লণ্ঠনের আলো দুলতে দুলতে নামছে।

বদ্রী কেদারকে আস্তে করে বললো, এই লণ্ঠনের আলোটা একটু আগে প্লাটফর্মের ওই দিকটা থেকে কেবিনঘরে ঢুকেছিলো। আমি দেখেছি। কেদার বললো, ঠিক আছে। এখন চুপ করে যা।

অমলবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, দ্যাখো, হতভাগাটা নিশ্চয়ই কেবিনঘরে বসে ঝিমোচ্ছিলো।

ভজুয়া ঘুম জড়ানো চোখে স্মার্ট হবার চেষ্টা করলো। ক্যায়া বাবু, পুছতা কিঁউ?

পুছেগা না তো কি আমার মুণ্ডু করেগা! যা! এই বাবুদের নিচের ওয়েটিং রুমটা খুলে দে। বেঞ্চিগুলো, মেঝেটা ভালো করে ঝাড় দিয়ে দিবি।

হায় রাম! ওয়েটিং রুমপর লাইট-উইট নেহী হ্যায় জী!

লাইট নেহী হ্যায় তো তোর লণ্ঠনটা রেখে আসবি। এই রাতে এনারা যাবেন কোথায় ? যা যা ! তাড়াতাড়ি যা !

পোর্টার ভজুয়া গজগজ করতে করতে নিচে চললো। ওর পেছনে হাঁটা দিলো কেদার-বদ্রী জুটি। যাবার আগে ওরা স্টেশন মাস্টার অমলবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললো না।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও সময় বয়ে যায়। রাত এখন দু'টো হবে। ওয়েটিং রুমের ঝাঁঝরি দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। সারাদিনের সাঙ্ঘাতিক গরমের পরে এই যা শান্তি। পুরো এলাকা ঘুমে কাদা হয়ে আছে। কেদার মজুমদার আর বদ্রীনারায়ণ ওয়েটিং রুমের ভেতর দু'টো বেঞ্চিতে অকাতরে ঘুমোচ্ছিলো। বদ্রী ঘুমের ভেতর অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখছিলো। দেখছিলো, গাঢ় অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি পা টিপে টিপে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। একটা গাছের সঙ্গে ওকে কারা যেন বেঁধে রেখেছে। ও নড়তে পারছে না। লোকটার হাতে একটা নাইলনের জাল। সেটা সে বদ্রীর দিকে ছুঁড়ে মারলো। ঝপ্-ঝপ্—বেশ জোরেই শব্দ হলো। ঘুম ভেঙে গেলো বদ্রীর। কেদার পাশ ফিরে শুলেন। বাইরে কিসের খসখস শব্দ ? বদ্রী মটকা মেরে পড়ে রইলো খানিকক্ষণ। নিস্তব্ধতার একটা কালো চাদর যেন ঢেকে দিয়েছে সমস্ত এলাকা। শুধু ঝিঁ-ঝিঁ-র বিরামহীন শব্দ একটানা চলছেই। শব্দটা যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে বদ্রীকে। ঝাঁঝরির ফোঁকর দিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের আধো অন্ধকার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলো বদ্রী। স্তিমিত আলোর লণ্ঠন হাতে একটা ছায়ামূর্তি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে রেললাইনের পাশের জমিতে নেমে পড়লো। বদ্রী তারপর আর কিছুই দেখতে পেলো না। কারণ ঝাঁঝরির ফোকর দিয়ে আর বেশি কিছু দেখা সম্ভব নয়। বদ্রী ভাবছিলো, কি হচ্ছে এখানে ? সবকিছু এখানে এমন সন্দেহজনক লাগছে কেন ?

হাইওয়েতে কালো জিপ

লস্করপুর ফরেস্টের যে সরকারি বাংলোয় কেদার আর বদ্রীর থাকার কথা ছিলো, সেখান থেকে ভাগীরথী নদী আধ মাইল দূরে। নদীর তীরেই শ্মশান। বাংলো থেকে উল্টোদিকের রাস্তায় ঠিক ততটা দূরেই ন্যাশনাল হাইওয়ে। ব্যস্ততম রাস্তা। প্রচুর গাড়ি চলে এই রাস্তায়। এখন রাত পৌনে তিনটে।

আকাশে অজস্র তারার ভিড় হলেও নিচে গহীন অন্ধকারের রাজত্ব চলছিলো। তখনই হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার চিরে উত্তরদিক থেকে একটা কালো রঙের জিপ ছুটে আসছিলো লস্করপুরের দিকে। প্রচণ্ড জোরে। হাইওয়ের ওপর সার দিয়ে ছুটে চলা মালবোঝাই লরিগুলোকে পাশ কাটিয়ে একেঁ-বেঁকে পাগলের মতো ছুটছিলো জিপটা। মোড়ের মাথায় এসে জিপ বাঁ দিকে মুন্সিগঞ্জের দিকে ঘুরলো। লস্করপুর ফরেস্টের বাংলো ডাইনে রেখে জিপ ছুটলো। এখানে ভাগীরথী পেরোলেই বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা। বর্ডারে সাঙঘাতিক চোরাচালান হয়। মুন্সিগঞ্জ থানাকে তাই রাতেও অ্যালার্ট থাকতে হয়।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ থানা থেকে ঠিক রাত তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট নাগাদ একটা পুলিস জিপ টহলদারিতে বের হলো। পুলিস জিপ যাচ্ছে লস্করপুর শ্মশানের দিকে বর্ডার এরিয়া কভার করতে। আর আগের কালো জিপটা আসছিলো লস্করপুর মোড় থেকে মুন্সিগঞ্জ স্টেশনের দিকে।

গত একমাস ধরে এই অঞ্চলে দারুণ দাবদাহ চলছে। একটুও বৃষ্টি হচ্ছে না। গাছ থেকে সবুজ পাতা সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। চাষের জমি ফেটে চৌচির। শ্যালো পাম্পে জল উঠছে না। মুন্সিগঞ্জে পানীয় জলের ট্যাঙ্কে প্রতিদিন চব্বিশ হাজার গ্যালন জল তোলা হয়। সেখানে এখন আট হাজার গ্যালনের বেশি জল উঠছে না। একটা ছন্নছাড়া অবস্থা চলছে। কেদারকে কালই কাজে নেমে পড়তে হবে। খরাপ্রবণ এই এলাকার সমস্যার পাশাপাশি পানীয় জলেব অভাব, পেটের রোগের সম্ভাবনার দিকগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার। কেদার জানেন, বদ্রী থাকলে অনেক লাভ। বদ্রীর অনুভূতিপ্রবণ মন মানুষকে দ্রুত চিনে নিতে সাহায্য করে। ওর নীল দু'চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সব সত্য যেন টিভি স্ক্রিনের মতো ফুটে ওঠে। কেদারের যাবতীয় ইনভেস্টিগেশনের কাজে বদ্রী একটা অ্যাসেট।

সেই বদ্রী এই এখন রাত তিনটের সময় মুন্সিগঞ্জ রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে শুয়ে একটা অস্বাভাবিক ঘটনার গন্ধ পেলো। মিনিট দশেক আগেই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। ও চুপচাপ শুয়েছিলো। কিন্তু ওর প্রখর ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করছিলো নীরবে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলো, বাইরে কারা যেন সতর্ক পায়ে হাঁটাচলা করছে। ওরা কারা? ফিসফিস করে ওরা কথা বলছে! সেইসব ফিসফিসানি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বদ্রীর শ্রবণেন্দ্রিয়ে কম্পন তুলে মস্তিষ্কে চলে যাচ্ছে। তখন ও বুঝতে পারছে, এই পরিবেশে আছে অপরাধের গন্ধ। বদ্রীর সেই নীল চোখ তক্ষুণি দারুণ সক্রিয় হয়ে

উঠলো। ও এবার পাশের বেঞ্চিটার কাছে গিয়ে আস্তে করে কেদারকে ঠেলা দিলো।

কেদারদা! ও কেদারদা! কেদার ধরমড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

আস্তে কেদারদা! বাইরে কি সব আওয়াজ পাচ্ছি।

কেদার চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মনোযোগটা বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

চার পাঁচজনের হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। স্টেশনের পশ্চিমদিকের গ্রাম থেকে কারা যেন এলো। বদ্রী স্পষ্ট শুনতে পেলো, কে একজন বলছে, কাজটা হয়ে গেছে। —কণ্ঠস্বরে নিশ্চিন্ত ভাব।

ওরা এখনো আসেনি? টাইম পেরিয়ে আধঘন্টা হয়ে গেলো—ফিসফিস করে চিন্তিত গলায় কে যেন বললো।

না আসেনি। —আরেকজন বললো।

বদ্রীর অসাধারণ শ্রবণেন্দ্রিয় এই কথাগুলো মস্তিষ্কে রেকর্ড করে রেখে দিলো। কেদার ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছিলেন ঠিকই, কিন্তু কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন না। তবে বদ্রী শুনতে পাচ্ছিলো স্পষ্ট। বদ্রীর মধ্যে যখন এই শক্তি জেগে ওঠে, ওর চোখ দু'টো থেকে যেন নীলাভ দ্যুতি ফেটে পড়তে চায়। কেদার দেখছিলেন সেটা।

তখন বাইরে দু'তিনটে পেনসিল টর্চের সরু তির্যক আলো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছিলো। চিলতে আলোর টুকরোগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিলো ঘাসের মাথা, শান বাঁধানো রাস্তা।

বদ্রী এবারও স্পষ্ট শুনতে পেলো, একজন ভারী গলায়, কিন্তু হতাশ ভঙ্গিতে বলছে, না। আর ওয়েট করা যাবে না। সট্‌কে পড়তে হবে। প্ল্যান একদিন পিছিয়ে দিচ্ছি। চ, চ! শেল্টারে ঢুকে পড়! অ্যাই! তুই এদিকে আয়! মাল নিয়ে আমার সঙ্গে যাবি।

এরপরই জায়গাটা আস্তে আস্তে চুপচাপ হয়ে গেলো।

রাত পৌনে তিনটে নাগাদ যে কালো জিপটাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে লস্করপুরের দিকে যেতে যেতে বাঁ দিকে মুন্সিগঞ্জমুখী চলতে দেখা গিয়েছিলো, তিনটে দশ মিনিট নাগাদ মুন্সিগঞ্জ লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে মুন্সিগঞ্জ থানায় জিপটা সেটাকে দেখে ফেলে। চ্যালেঞ্জও করে। কালো জিপটা গতি কমালো দেখে পুলিস জিপটা দাঁড়িয়ে পড়লো। সেকেণ্ড অফিসার লাফিয়ে জিপ থেকে নেমে কালো জিপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনই হঠাৎ কালো জিপটা

সাঁ করে মুখ ঘুরিয়ে টপ গিয়ারে উল্টোদিকে ছুটলো। হতচকিত পুলিসগুলো জিপের নাম্বারটা পর্যন্ত নিতে পারলো না। এদের জিপ ফের স্টার্ট দিয়ে স্পিড তুলতে তুলতে দু'টো জিপের মধ্যেকার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেলো। মাইল পাঁচেক তাড়া করেও কোন লাভ হলো না। হাইওয়েতে উঠে অজস্র ট্রাক আর মোটরের ভিড়ে সেই জিপ হারিয়ে গেলো। হাইওয়ের ওপর তখন ট্রাকগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলো। কাদের জিপ? কী করতেই বা এসেছিলো? কোথায় যাচ্ছিলো? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে ঘুরপাক খেলেও টহলরত পুলিস তার কোন সদুত্তর পেলো না।

কি ঘটলো গভীর রাতে?

পরদিন সকাল ন'টা। মুন্সিগঞ্জ থানার ওসি-র ঘরে কেদার আর বদ্রী বসেছিলো। কেদার কথা বলছিলেন ওসি-র সঙ্গে। কেদার ঈষৎ উত্তেজিত।

দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, একজন সফল গোয়েন্দাকে তো শিখতেই হবে,

কেমন করে চোখ খুলে সব কিছু দেখে নিতে হয়। কেমন করে শব্দ শুনতে হয়। কেমন করে শব্দ মেপে দূরত্ব আন্দাজ করতে হয়। কেমন করে বাতাস শুঁকে বিপদের ঘ্রাণ পেতে হয়। বিপজ্জনক কাজের রীতিটাই এমনি। আপনি বহুদিন পুলিসে আছেন। আপনাকে আর আমি এ ব্যাপারে কী-ই বা বলবো!

হুঁ। ঠিক আছে। সবই বুঝলাম। তবুও কাল রাতের ঘটনা আপনাদের কাছে সন্দেহজনক কেন মনে হলো? ব্যাখ্যা দিতে পারেন? ওসি রমাপদ চ্যাটার্জি কেদার মজুমদারের দিকে খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই এই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

ওসি-র তাচ্ছিল্য দেখে কেদার বেশ বিরক্ত হলেন। বললেন, দেখুন অফিসার, আমরা মুন্সিগঞ্জে এসেছি রিপোর্টিংয়ের কাজে। কোন ঝুটঝামেলা খুঁজে বেড়ানো এখন আমাদের কাজ নয়। কাল রাতের বিষয় যা আমাদের কাছে সন্দেহজনক লেগেছে, তাই আপনাকে জানিয়ে গেলাম। পরে ভালোমন্দ কিছু হলে দায়িত্ব আপনার।

বদ্রী এতক্ষণ চুপচাপ ছিলো। ওসি-র তাচ্ছিল্য দেখে বদ্রীও বেশ খেপে গিয়েছিলো। এবার ও ওর সাইডব্যাগ থেকে ওদের ভিজিটিং কার্ড বের করলো।

এই নিন কার্ড। আমাদের নাম লেখা আছে। আমাদের ডিটেকটিভ কনসার্নের নাম 'উদিতভানু ইনফরমেশন'। বাগবাজার, কলকাতা।

এতে ওসি সাহেব যেন আরো মজা পেলেন। বললেন, আচ্ছা আচ্ছা! তা'হলে সাংবাদিকতাটা হচ্ছে আপনাদের শখের ব্যাপার। গোয়েন্দাগিরিটাই আসল। তাই না!

কোনটাই সখের ব্যাপার নয়। সখ করে খরা এলাকায় রোদে পুড়তে আসিনি নিশ্চয়ই! প্রত্যেকটা কাজই আমাদের কাছে সিরিয়াস। আমরা রাতের ব্যাপারটা—

বদ্রী এবার কেদারের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জোরের সঙ্গে ওসি-কে বললো, আপনি আমার এই কথাগুলো লিখে রাখতে পারেন। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। শুনুন! বদ্রীর চোখে তখনই এক অদ্ভুত আলোর ঝিলিক খেলে গেলো।

বলো শুনি। ওসি-র সেই একই অবজ্ঞার ভঙ্গি।

বদ্রী প্রায় ধ্যানস্থের মতো বলতে শুরু করলো। —কাল রাতে মুন্সিগঞ্জ স্টেশনের কাছে কোন বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে। চুরি অথবা ডাকাতি, কিছু একটা হয়েছেই। দুই; চুরি করা মাল চোরেরা সরিয়ে ফেলতে পারেনি। তিন; সরিয়ে ফেলতে পারেনি, কারণ, যারা মাল সরাবে, তারা কোন কারণে,

এসে পৌঁছায়নি। চার ; যারা আসতে পারেনি, তারা রাস্তায় কোন ঝামেলায় পড়েছিলো। খোঁজ নিলেই সেটা জানা যাবে। পাঁচ ; ওরা আজ রাতে মাল সরাবার প্ল্যান নেবেই।

কেদার বদ্রীর কথাগুলো শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলেন। বদ্রী এতটা অনুমান করে নিলো কিভাবে? অবাক হবারই কথা! তবুও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে ওসি-কে বললেন, আমরা চলি। আমরা এখন মুন্সিগঞ্জ নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির কাছে যাবো। তারপর কাছাকাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যাবো।

তা'হলে চললেন ?

কেদার ওসি-র কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, মিস্টার চ্যাটার্জি, যদি মনে করেন, আমাদের আপনার কোন প্রয়োজনে লাগবে, তা'হলে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ লস্করপুর ফরেস্টের গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউসে খবর দেবেন। আমরা ওখানেই থাকবো। এবার চলি।

ওসি-র প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই কেদার বদ্রীকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। মুখে বললেন, মোস্ট বোগাস! এই সব দারোগা যদি থানায় থাকে, তবে চুরি-ডাকাতি চোরাচালান হবে—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে!

বদ্রী বললো, এবার তা'হলে কি করবে কেদারদা ?

মুন্সিগঞ্জ নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির কাছে যাবো। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবো। কালকে কয়েকটা গ্রামে যেতে হবে। গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে সরাসরি কথা না বললে, পরিস্থিতি নিজেদের চোখে না দেখলে লেখা কিছুতেই জীবন্ত হবে না।

শেষ বৈশাখের দারুণ নিদাঘ। সারা মুন্সিগঞ্জ জুড়ে লু বইছে। এরই মধ্যে কখনো রিকশা ভাড়া করে, কখনো হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দু'জনে খরার রিপোর্ট নিতে লাগলো। আজকে শুধুই সরকারি রিপোর্ট। কালকে ওরা খরা এলাকায় যাবে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওরা লস্করপুর ফরেস্টের বাংলোয় চলে গেলো। চানটান করে, দুপুরের খাওয়া সেরে দু'জনে একটু রেস্টও নিয়ে নিলো। বিকেলে ফরেস্ট অফিসার দিব্যেন্দু মজুমদার এলেন। চা খেতে খেতে ওঁরা কথা বলছিলেন।

দেখুন, গরিব মানুষের রুজি-রোজগারের ঠিকমতো ব্যবস্থা না হলে আপনি

ফরেস্টের গাছ কাটা আটকাতে পারবেন না। দিব্যেন্দুবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন।

কেদার সায় দিয়ে বললেন, ঠিকই বলেছেন দিব্যেন্দুবাবু। পাহাড় অঞ্চলেও একই ঘটনা ঘটছে। কিন্তু খরার সময়েও যদি অরণ্য ধ্বংস বন্ধ করা না যায়, তবে তো প্রাকৃতিক ভারসাম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ষা নামবেই না।

হ্যাঁ। অবশ্য খরা সামলাতে রাজ্য সরকারের টাকাও এসে পৌঁছেছে। লস্করপুর ফরেস্ট বাঁচাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শুনলাম, মাটির নিচে জলস্তর নাকি চার মিটারের মতো নেমে গেছে?

ঠিকই শুনেছেন।

ফরেস্ট বাংলোর ভেতরে ওঁরা যখন কথাবার্তা বলছিলেন, বাইরে সেই সময়ই একটা পুলিস জিপ এসে থামলো। জিপ থেকে একজন নেমে দাঁড়ালো। দেখে গেস্ট হাউসের দারোয়ান ছুটে গেলো।

আজ্ঞে স্যার?

এখানে কলকাতা থেকে কেদার মজুমদার নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন না? সঙ্গে একটি ছেলেও এসেছে।

হ্যাঁ স্যার। আছেন।

ওনাকে গিয়ে বলো, থানা থেকে ডাকতে এসেছে।

আচ্ছা স্যার। বলেই অল্পবয়সী দারোয়ানটি দৌড়ে গিয়ে কেদার মজুমদারকে খবর দিলো।

মিনিটখানেকের মধ্যেই কেদার বাইরে বেরিয়ে এলেন। পেছনে বদ্রীনারায়ণ। কেদার পুলিস অফিসারটিকে দেখে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন! আপনাকে খুব চেনা লাগছে। কিন্তু মুন্সিগঞ্জ থানায় তো আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি!

আমি মুন্সিগঞ্জ থানার সেকেণ্ড অফিসার। বিনয় ভট্টাচার্য। গতবছর পুরুলিয়া সদরে আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য কথা হয়েছিলো। তাই চেনা চেনা লাগছে। ওখানে তো আপনি মিসিং কেসটা দারুণ সলভ্ করলেন।

ভালোই হলো আপনার সাথে দেখা হয়ে। আপনাদের ওসি-কে কনভিন্স করাতে করাতেই তো অপরাধীরা পালিয়ে যাবে।

আর কনভিন্স করানোর দরকার নেই। স্যার যথেষ্ট কনভিন্স হয়ে গেছেন। কাল রাতে দু'টো ঘটনা ঘটেছে। তাই আমি এখানে ছুটে এলাম।

বদ্রী এতক্ষণে মুখ খুললো। আমি জানি তো! কাল রাতে কিছু ঘটেছেই!

ততক্ষণে সবাই ড্রইংরুমে ঢুকে পড়েছে। সেকেণ্ড অফিসার ফরেস্ট অফিসার দিব্যেন্দু মজুমদারকে দেখেই বললেন, আরে আপনি?

হ্যাঁ। মুন্সিগঞ্জের খরা নিয়ে কথা বলছিলাম কেদারবাবুদের সঙ্গে। কিন্তু কি ব্যাপার?

বলছি। আগে বসি। জল খেতে হবে। ঠা ঠা রোদ্দুরে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।

জলটল খেয়ে বিনয়বাবু যখন ধাতস্থ হয়ে বসলেন, ওরা সবাই তখন উৎসুক হয়ে রয়েছেন ঘটনা শুনবার জন্য। বিনয়বাবু এবার কথা শুরু করলেন।

মুন্সিগঞ্জের এককালের জমিদার চৌধুরী বংশের মালিকানায় একটা টেরাকোটার মন্দির আছে স্টেশনের পাশের গ্রামে। রাধাবল্লভ জীউর মন্দির। মন্দিরের ভেতরে ল্যাটেরাইট পাথর সেট করে তৈরি করা গর্ভগৃহে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের একটা অষ্টধাতুর মূর্তি আছে। অর্থাৎ রাধার বল্লভ যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের। তাই গ্রামের নাম হলো বল্লভপুর। ১৬৬৫ সালে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজা বীরসিংহ রাজত্ব করছিলেন। তখন মুন্সিগঞ্জের জমিদার ছিলেন রাজনারায়ণ চৌধুরী। রাজনারায়ণ চৌধুরীর অনুরোধে রাজা বীরসিংহ বিষ্ণুপুর থেকে একদল টেরাকোটা শিল্পীকে মুন্সিগঞ্জে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরাই রাধাবল্লভের মন্দির তৈরি করেন।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন, মন্দিরে কি কোন পুজো আচ্চা হয়?

কৃষ্ণমূর্তির পুজো হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, কৃষ্ণমূর্তিটি যতটা না দামী, তার চেয়ে বেশি দামী মূর্তিটি যে বেদীর ওপর বসানো আছে, সেই বেদীটি।

বদ্রী তন্ময় হয়ে কাহিনী শুনছিলো। উৎসুক চোখে ও জিজ্ঞেস করলো, কেন?

আইভরির মধ্যে গোটা দশেক মূল্যবান পাথর সেট করে বেদিটি গর্ভগৃহের ল্যাটেরাইট পাথরের মেঝের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো। সেই পাথরগুলোই অন্ধকার গর্ভগৃহ আলো করে রাখতো। আইভরির সেই বেদী কাল রাতে চুরি গেছে। আজ সকালে পুজারী পুজো দিতে গিয়ে দেখে গর্ভগৃহ অন্ধকার। মূর্তি আছে, কিন্তু বেদী নেই।

বদ্রী ভাবছিলো, রবীন্দ্রসদন চত্বরে ওর অবচেতনে ভেসে ওঠা দলমা পাহাড়ের হাতি, হাতির দাঁত আর শ্বেতশুভ্র বেদীর কথা। ও বললো, কাল

রাতে এমন কিছু একটা ঘটেছে, তা থানায় গিয়ে ওসি-কে বলেও এসেছিলাম। বদ্রীর গলায় এখন আরো আত্মবিশ্বাসের ছাপ।

আর একটা সন্দেহজনক ঘটনাও ঘটেছে। বিনয় ভট্‌চায্ বললেন। আমাদের টহলদারী জিপ কাল মধ্যরাতে লস্করপুরের রাস্তায় অচেনা একটা কালো জিপের মুখে পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পুলিস জিপ দেখে ওটা কায়দা করে পালিয়ে যায়। ওটা আর মুন্সিগঞ্জে ঢোকেনি।

বদ্রী এবার ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে বললো, আমি জানি। চুরি যাওয়া আইভরির বেদী এখনো মুন্সিগঞ্জে আছে। পাচার হয়নি। তা'হলে ওই জিপটারই কাল স্টেশনে যাবার কথা ছিলো। ওটা যেতে পারেনি। —বদ্রী যেন বহুদূর থেকে কথা বলছিলো। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে ছিলো সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জোর। কেদার বদ্রীর এই অবস্থার সঙ্গে পরিচিত। উনি বদ্রীকে লক্ষ্য করছিলেন। বদ্রীর নীল চোখের দৃষ্টি তখন বহুদূরে চলে গেছে।

তখনই দারোয়ান শঙ্কর ট্রে-তে করে ওমলেট, স্ন্যাক্স আর কফি নিয়ে ঢুকলো। কেদার বললেন, আগে তা'হলে কফি খাওয়া হোক। পরে এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে সূত্র খোঁজা যাবে।

ঘটনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষণ যখন শুরু হলো, তখন সন্ধ্যে ছ'টা। ফরেস্ট অফিসার দিব্যেন্দুবাবু চলে গেছেন। বাংলোয় কেদার মজুমদারের ঘরে তখন বিনয় ভট্টাচার্য, বদ্রীনারায়ণ আর কেদার নিজে। বিনয়বাবু বললেন, মন্দিরের পুজারী আর কেয়ারটেকারকে আমরা সন্দেহের তালিকায় রেখেছি।

সেটা স্বাভাবিক। তবে ওদের এই মুহূর্তে অ্যারেস্ট করে মূল পাণ্ডাদের অ্যালার্ট না করাই ভালো।

এই চুরিতে বাইরের লোক আছে সম্ভবত পাঁচ থেকে ছ'জন। —বদ্রী বললো। —যে দলের পাণ্ডা, তার গলাটা বেশ ভারী। সিনেমার নায়কের মতো। স্টেশনের পোর্টার ভজুয়াকে জেরা করলে লোকগুলো সম্পর্কে কিছুটা জানা যাবে। ভজুয়াকে ওরা পটিয়েছে মনে হচ্ছে।

কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে মুন্সিগঞ্জ থেকে বেরনো যায়? —কেদার জিজ্ঞেস করলেন।

প্রথমত ট্রেনে। তবে ওরা সে রিস্ক নেবেনা। বিনয় ভট্‌চায্ বললেন। দ্বিতীয়ত সড়কপথে। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে। ও দিকটা সিল করে দেবো

আমরা। আমাদের জিপ টহল দেবে। রেল স্টেশনে সাদা পোশাকে পুলিস থাকবে। ওদের তৃতীয় রাস্তা হতে পারে গঙ্গার পাড়ে লস্করপুর শ্মশানঘাট হয়ে ওপারে চলে যাওয়া। ওপারে নো ম্যান্‌সল্যান্ড। সেখান থেকে পদ্মা পেরিয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা।

এ-সব পুরাতাত্ত্বিক জিনিস বিদেশের বাজারে লাখ লাখ ডলারে বিক্রি হয়। এরা বাংলাদেশেও ঢুকতে পারে।

তা'হলে আজ মুন্সিগঞ্জ থেকে বেরোবার মূল রাস্তাগুলোয় পাহারা থাকছে ?

হ্যাঁ। বড়বাবুকে আমি ফোনে বলে দিচ্ছি ভজুয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। পুলিস ভজুয়ার সাথে কথা বললে ওরা আর রেল স্টেশনের দিকে আসতে চাইবে না। শ্মশানঘাটের দিকটায় থাকছি আপনি, আমি আর বদ্রীনারায়ণ।

বদ্রী কি ভেবে বললো, পুজারি আর ভজুয়াকে অ্যারেস্ট না করাই ভালো। পুলিস কতটা ভেবেছে, বুঝতে দেওয়ার দরকার নেই। ওদের ওপর নজর রাখলেই হবে।

ঠিকই বলেছিস বদ্রী। আমারও মতে, আমাদের টোটাল চিন্তা-ভাবনার কোন আভাস না দেওয়াই ভালো। সন্দেহজনক প্রত্যেককে নজরের মধ্যে রাখার কথাই বলে দিন বিনয়বাবু। —কেদার বললেন।

তাই হোক। আপনাদের আইডিয়াটা নিলে ক্ষতি কিছু নেই। লাভ হলেও হতে পারে।

সবটাই লাভ। বদ্রী বললো। অপারেশন আইভরির কাজ স্টার্ট করুন বিনয়বাবু। সময় নষ্ট হলেই বরং ক্ষতি হবে আমাদের।

ওরা সবাই উঠে পড়লো। সেকেণ্ড অফিসার বিনয় ভট্টাচার্য বাংলোর অফিসঘর থেকে মুন্সিগঞ্জ থানায় ফোন করে সমস্ত ঘটনা ও পরিকল্পনার কথা ওসি-কে জানিয়ে দিলেন। তারপর কয়েক ঘন্টা ধরে চললো পুলিসী তৎপরতা। সদর থানার কাছে দু'টো জিপ চাওয়া হলো। ওরা ন্যাশনাল হাইওয়ের মুখটা পাহারা দেবে। স্টেশনের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং ওসি রমাপদ চ্যাটার্জি।

রাতে শ্মশানঘাটে ফাঁদ !

কেদার মজুমদার ঘড়িটা একবার দেখে নিলেন। রাত একটা বেজে পনের মিনিট। গভীর রাত। সেকেণ্ডের কাঁটার টিক্‌টিক্ শব্দটাও কানে আসছে।

তবে লস্করপুর শ্মশানঘাট এই মধ্যরাতেও একেবারে নিস্তব্ধ নয়। একটা চিতা জ্বলছে। শ্মশানে বিদ্যুতের আলো নেই। চিতার লাল আগুনের কাঁপা কাঁপা আলোয় সবকিছুই ভৌতিক লাগছে।

যে চিতাটা জ্বলছে, তাকে ঘিরে আত্মীয়-স্বজনরা বসে আছে। সেখানে একটা হ্যাজাকও জ্বলছে অবশ্য। শ্মশানের একটু ওপরে একটা ছোট্ট পাকা ঘর আছে। সেই ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন কেদার। পাশে বদ্রী। একটু দূরে, নিচে গাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে। ওপারে গাঢ় অন্ধকার। সেখানে কোন জীবনের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিলো না। ঘটনাবিহীন সময় এগোচ্ছিলো বড্ড আস্তে আস্তে। আকাশ পরিষ্কার। অজস্র তারার মেলা। চাঁদ নেই। শুক্লপক্ষ চলছে। রাত বারোটার পর চাঁদ চলে গেছে পৃথিবীর অপর পিঠে। কেদার আবার ঘড়ি দেখলেন। একটা সাঁইতিরিশ। তাহলে কি ওরা অন্য রাস্তা নিলো? না কি বদ্রীর সমস্ত অনুমানই ভুল! কিন্তু আজও পর্যন্ত বদ্রীর চিন্তা-ভাবনায় কোন ভুল হয়নি।

কিরে বদ্রী! কি মনে হচ্ছে?

ওরা এদিকেই আসবে। —বদ্রী অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী।

মধ্যরাতে পৃথিবীর বুকে গাঢ় অন্ধকার যেন চেপে বসতে চাইছে। সময় আর পেরোয় না। তবুও সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কেদার ভাবছিলেন, শুধুমাত্র গতরাতের কিছু অস্পষ্ট কথাবার্তা আর রাধাবল্লভ জীউ মন্দিরের চুরির ঘটনাকে যুক্ত করে বদ্রী এমন একটা সিদ্ধান্তে এসেছে, যেখানে দ্বিতীয় কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য নেই। সবটাই আঙ্কিক অনুমান। এ অনুমান না মিললে বিশেষ করে ওই ওসি রমাপদ চ্যাটার্জি সহজে আমাদের ছাড়বে না। খবার রিপোর্টিং করা লাটে উঠে যাবে তখন। বদ্রী বোধহয় কেদারের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলো। জিজ্ঞেস করলো, কেদারদা, কি ভাবছো?

ভাবছি, আমাদের অঙ্কের ফলাফল কারেক্ট না হলেই মুশকিল।

অঙ্কে কোন ভুল নেই কেদারদা! অন্ধকারেও বদ্রীর নীল চোখ জ্বলে উঠলো। —বড়জোর ওরা অন্য রাস্তায় পালাতে পারে। এর বেশি কিছু নয়।

দু'জনে চুপ হয়ে গেলো। এত সাহসী কেদারও আজানা এক আশঙ্কায় চিন্তিত হয়ে উঠলেন। অন্ধকার এবং নৈঃশব্দ্য, এতো আছেই। কিন্তু নৈঃশব্দ্যেরও একটা শব্দ থাকে। রাত্রির শব্দ, শ্মশানে শবদাহের শব্দ। নিচে জ্বলন্ত চিতায় পোড়া কাঠ ফাটার ফট্ ফট্ শব্দ হচ্ছিলো মাঝে মাঝে। ঝিঁ ঝিঁ-র একটানা ডাকের পাশাপাশি সর-সর-সর-সর করে একটা শব্দ যেন

ঘুরে বেড়াচ্ছিলো এই ছোট ঘরটার চারপাশে। বদ্রী কান খাড়া করলো। বিপদের গন্ধ পেলো বদ্রীনারায়ণ। ওর নীল চোখে আলো খেলে গেলো। ও ডাকলো, কেদারদা!

কী?

দরজার দিকে দেখো। কেদার দরজার দিকে তাকালেন। একটা কালো বস্তুর নড়াচড়া টের পেলেন। হাতের পেনসিল টর্চটার আলো ছিটকে গেলো দরজার গোড়ায়।

সাপ!

টর্চ নেভাও কেদারদা!

বিশাল মোটা, গায়ে ভয়ঙ্কর চক্রবক্র দাগের একটা সাপ ঘরের অর্ধেকটায় ঢুকে পড়েছে। সর সর শব্দে বিরাট সাপটার পুরো শরীরটাই এবার ঘরের ভেতর। দু'জনে নিশ্বাস বন্ধ করে একেবারে নিশ্চুপ। ঘরের মেঝের মধ্যে সাপটা এঁকেবেঁকে চলছে তখনও। বদ্রীর পায়ের দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে লেজটা চলে গেলো। বদ্রীর নীল চোখ জ্বলছে। অদ্ভুত আলো ওর চোখে। ও সাপটার গতিবিধি সব দেখতে পাচ্ছিলো। অন্ধকার সয়ে যাওয়ায় কেদারও সাপটার চলাফেরা দেখতে পাচ্ছিলেন। আবার সাপটা ওদের কাছাকাছি চলে এসেছে। হিস-হিস শব্দ হচ্ছে। সাপটা কি ওদের দু'জনের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে? মৃত্যু এবার ওদের সামনে ছোবল মারবার অপেক্ষায়। ঠিক কেদারের হাঁটু বরাবর সাপটা এবার ফনা তুলে দাঁড়ালো। কেদার চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে গেলেন। চোখ বুজে মরণের অপেক্ষা করতে লাগলেন। বদ্রী নিরুপায় দাঁড়িয়ে। এবার ফনা দোলাচ্ছে সাপটা। ঝিলিক দিয়ে উঠছে সাপের গায়ের কালো-সাদা-লাল-বেগুনী রঙের বীভৎস পিচ্ছিল দাগ। হিস্ হিস্ শব্দটা এবার আরো বেড়ে গেলো। সরু জিভটা ক্রমাগত আগুপিছু করছে। অন্ধকার শ্মশানঘাটে এভাবেই মৃত্যু-ছোবল ফনা দোলাচ্ছিলো কেদারের সামনে। বদ্রী পাশেই। এবার সাপটা ফনাশুদ্ধু ঝাঁপিয়ে পড়লো। হিস্-হিস্ ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ উঠলো। কেদার মনে মনে বললেন, এই শেষ!

খানিকক্ষণ ঝটপটানির শব্দ। বদ্রী চোখ ফিরিয়ে দেখলো, কেদারের পাশেই সাপটা কি একটা বস্তু মুখে পুরে ঝটাপটি খাচ্ছে।

কেদারদা!

অ্যাঁ।

সরে এসো কেদারদা, টর্চটা জ্বালাও।

কেদারের হাত যেন অবশ হয়ে আসছে। তবে ওর শরীরে ছোবল পড়েনি! টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। সাপটার মুখে একটা বড় সাইজের ব্যাঙ। তখনো সবটা মুখে ঢোকেনি। ব্যাঙের পেছনের পা দু'টো তখনো অসহায় অবস্থায় কাঁপছে। কোঁ কোঁ শব্দ করছে মৃত্যুমুখী ব্যাঙটা। আস্তে আস্তে পা দু'টোও চলে গেলো সাপের মুখের মধ্যে। দু' এক ফোঁটা তাজা রক্ত চলকে পড়লো মেঝেতে। এবার ওই বিশাল সরীসৃপটা ভয়ঙ্কর সেই শরীর নিয়ে দরজার দিকে এগলো। নেমে গেলে ঘরের বাইরে। সর সর-সর সর শব্দটা বহুক্ষণ ওদের কানে বাজতে লাগলো। দু'জনেরই গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেকক্ষণ ওরা কোন কথাই বলতে পারলো না।

তারও পর কেটে গেছে আরো অনেকটা সময়। দু'জনেই নিজেদের সামলে নিয়েছে। কেদার কথা বললো।

বদ্রী!

হুঁ।

ঠিক আছিস?

হুঁ।

আবার দু'জনে চুপ করে গেলো। এই অন্ধকারে, মূর্তিমান মৃত্যুদূতের গা ঘেঁষে বেরিয়ে আসা দু'টি মানুষ স্তব্ধতাকে আঁকড়ে ধরে এখনো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার আঁচ নিচ্ছিলো। বিপদ পাশ কাটিয়ে চলে গেলে তবেই তাকে নিয়ে ভাববার সময় পাওয়া যায়। নইলে তো সবই শেষ।

ওদিকে অগ্নিময় চিতা থেকে লক্লকে আগুন আর সাদা-কালো ধোঁয়া আকাশটা ছায়াচ্ছন্ন করে দিচ্ছিলো। বদ্রী আবার চমকে উঠলো। কিসের শব্দ আবার? বদ্রী উৎকর্ণ হলো। বদ্রীর অবচেতন মনের সমস্ত বন্ধ জানালা-কপাট খুলে যেতে লাগলো। যে বিপদের আঁচ পেয়েছিলো ও কলকাতায়, রবীন্দ্রসদনে, তারই ছোঁয়া লাগলো ওর মনে। ও ওর সমস্ত চিন্তা আর শ্রবণশক্তিকে একাগ্র করলো। ডুব দিলো গভীরে। আবার কিসের শব্দ! শব্দের উৎস সন্ধানে নামলো বদ্রীনারায়ণ। যার চোখে ভিন্নগ্রহের রঙ খেলা করে, যার ভাবনা সকলের ভাবনাকে ছাপিয়ে চলে যায় গভীরে, সেই বদ্রীনারায়ণের চেতন থেকে অবচেতনে যাওয়ার প্রত্যেকটা মুহূর্তকে লক্ষ্য করছিলেন কেদার। কেদার বুঝতে পারছিলেন, আসল ঘটনার শুরু হবে এবার।

হোহো-হোহো, হোহো-হোহো

বহুদূরে একটা অস্পষ্ট কোলাহল। ঠিক কোলাহল নয়, অনেক মানুষের উচ্চারিত কিছু শব্দ। সেই শব্দ বদ্রীর কানে এসে ধাক্কা মারছিলো। সেই শব্দের একটা তাল আছে, ছন্দ আছে। শব্দটা বদ্রীর কানে এভাবে ধাক্কা মারছিলো—হুঁহুঁ হুঁহুঁ—হুঁহুঁ হুঁহুঁ! হুঁহুঁ হুঁহুঁ—হুঁহুঁ হুঁহুঁ! হো হো হো হো—হোহো হোহো! হোহো হোহো হোহো হোহো! যত সময় পেরোচ্ছিলো, ছন্দ এক থাকলেও যেন কথাগুলো পাল্টে যাচ্ছিলো। এখন কথাগুলো মনে হচ্ছে লোলো লোলো—লোলো লোলো! বদ্রীর কানে শব্দগুলো আরো এগিয়ে আসে। ওলা ওলি—ওলি ওল! ওলাওলি—ওলি ওল! বদ্রী কেদারকে ঠেলা মারে।

শব্দ শুনতে পাচ্ছো তো?

হুঁ। অস্পষ্ট। বদ্রী আবার একাগ্র হয়। এবার স্পষ্ট শুনতে পায়—বল হরি—হরিবোল! বল হরি—হরিবোল!

শুনছো তো?

হ্যাঁ।

আর একটা মড়া আসছে।

হ্যাঁ। এখানে অনেক দূর থেকেও মড়া আসে।

এত রাতে?

অনেক দূরের গ্রাম থেকে আসছে হয়তো। বিহারের গ্রাম থেকেও মড়া পোড়াতে আসে অনেকে। দিব্যেন্দুবাবু বলেছিলেন অবশ্য। কাছাকাছি তো আর কোথাও কোন পাকা শ্মশানঘাট নেই। অনেকে আবার গঙ্গাতীরেই দাহ করতে চায়।

এদিকে যে চিতা জ্বলছিলো এখানে, তার বোধহয় আধাআধি পুড়েছে। নতুন করে কাঠ দিচ্ছে শ্মশানযাত্রীরা। লক্‌লকে আগুনের আভায় শ্মশানযাত্রীদের মুখগুলো লাল টকটকে লাগছে। যেন কোন প্রেতপুরীর অধিবাসী এরা। কাঠপোড়া কালো ধোঁয়া মিশে যাচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে। অজানা এক আশঙ্কায় বদ্রীর বুকটা কেঁপে উঠলো। তক্ষুণি বেশ কাছে থেকে বিকট গলার সেই আওয়াজ ওকে একেবারে নাড়িয়ে দিলো—বল হরি—হরি বোল! বল হরি—হরিবোল! কেদার বললেন, বদ্রী, সব দিক নজর রাখিস। আমি দেখছি এদিকটা। কেদার একবার ওর কোমরে গুঁজে রাখা কোল্ট রিভলভারটা

যথাস্থানে আছে কিনা, দেখে নিলেন। ফের বললেন, কোনরকম সন্দেহ হলে সিগন্যাল দেখাবি। আমার বুক বরাবর টর্চের আলো ফেলবি। দু'বার। আমি একটু নিচে নেমে গিয়ে ওই গাছের আড়ালে দাঁড়াচ্ছি।

কেদার ধীর পায়ে কোন শব্দ না করে নিচে নেমে সামনের একটা তেতুঁলগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। এদিকে এতক্ষণে দূরে রাস্তায় বাঁকের মুখে সেই শবযাত্রীদের আলো দেখা গেলো। দু'টো আলো। হ্যাজাক নয়। অনুজ্জ্বল আলো। বোধহয় কেরোসিন লণ্ঠন। শববাহকদের হরিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বল হরি—হরিবোল! বল হরি—হরিবোল! বদ্রী ছোট ঘরটায় চুপচাপ বসে চারদিক দেখে যাচ্ছিলো। সেই অন্ধকারে ভাগীরথীও বয়ে চলেছিলো তার নিজস্ব গতিতে।

রাতচরা পাখির ডানার শব্দ, ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাক, নদীর কুলুকুলু বয়ে যাওয়ার শব্দ, ওদিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসা শবযাত্রীদের হরিধ্বনি—সব মিলে যেন একটা সুরতাল ছন্দ তৈরি হয়েছে। নদীর জলের ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলছে। বদ্রীনারায়ণ প্রকৃতি আর মানুষের এই বহমান ঘটনাবলীর কার্যকারণ সূত্র খোঁজার চেষ্টা করছিলো।

এদিকে গাছের আড়াল থেকে কেদার দেখছিলেন, জ্বলন্ত চিতা ঘিরে বসে আছে কিছু মানুষ। ওদিকে সেই এগিয়ে আসা শবযাত্রীরা শ্মশানে ঢুকে পড়েছে। যে শবটি দাহ করা হচ্ছিলো, তার থেকে বেশ খানিকটা তফাতে ওরা খাট নামালো। পরিশ্রান্ত শবযাত্রীদের কয়েকজন লণ্ঠন দু'টো মাটিতে রেখে একটু বিশ্রাম নেবার জন্য ঘাসের ওপরই বসে পড়লো। একজন হাঁটতে হাঁটতে যে মড়াটা এতক্ষণ পোড়ানো হচ্ছিলো, সেখানে গেলো। —বদ্রী খুঁটিয়ে দেখছিলো সব কিছু। —দু'জন গেলো নদীর দিকে। আবার ফিরে এলো ওরা। বদ্রী সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলো না এদের মধ্যে।

কেদার বারবার বদ্রীর দিকে তাকাচ্ছিলেন সঙ্কেতের অপেক্ষায়। কোন সঙ্কেত না পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত রইলেন। তবুও সমস্ত পরিস্থিতি কেমন যেন থমথমে হয়ে গেলো। বদ্রীর সতর্ক চোখ সার্চলাইটের মতো চতুর্দিকে ঘুরছিলো। একটা ক্ষীণ অ্যালার্ম যেন বেজে উঠলো ওর অবচেতনে। ও এবার সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে গুছিয়ে নিলো। ও দেখতে পেলো, যে দু'টো লোক গঙ্গার একদম তীরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলো, ওরা ফের সেদিকেই যাচ্ছে। একজনের হাতে একটা মাটির হাঁড়ি। ওরা কোণাকুণি

নদীপাড়ের দিকে যাচ্ছিলো। ওখানটা অন্ধকার। একটা বড় শিরীষগাছের ছায়া শ্মশানের সমস্ত আলো আটকে দিয়েছে। সেই অন্ধকারেও, বদ্রীর মনে হলো, একটা ডিঙি নৌকো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে শবের খাটের কাছে বসে থাকা লোকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো আর একজনকে।

ওরা জল আনতে গেছে?

হ্যাঁ গেছে।

নৌকোটৌকো আছে নাকি নদীতে?

আছে। ওরা দেখে এসেছে।

নৌকোয় মাঝি ক'জন?

দু'জন।

সব তা'হলে ঠিকই আছে?

হ্যাঁ।

দূরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলো যে লোকটা, তার কাছে একটা লণ্ঠন ছিলো। সে এবার নির্দেশের ভঙ্গিতে বললো, তা'হলে আর দেরি নয়! চিতা সাজিয়ে ফেলো!

কথাটা শোনামাত্রই চমকে উঠলো বদ্রী। ওর নার্ভগুলো জেগে উঠলো। সতর্ক হলো বদ্রী। কান পাতলো বদ্রী। লোকটা তখনও খুঁটিনাটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলো। সেই ভারী গলা! যে গলার আওয়াজ ও গতরাতে মুন্সিগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসে শুনতে পেয়েছিলো। ও আর দেরি করলো না। পেন্সিল টর্চে কেদারকে সিগন্যাল দিয়ে দিলো। সিগন্যাল পেয়ে কেদার ওর হাতের ওয়াকিটকির বোতাম টিপলো।

হ্যালো! ওভার।

হ্যালো। আমি বিনয় ভট্টচায্ বলছি। ওভার।

বোধহয় শ্মশানেই। ওভার।

ঠিক আছে। ওভার।

বদ্রীর চোখ-কান দুই-ই কাজ করছিলো। এদিকে ও দেখতে পাচ্ছিলো ডিঙি নৌকোটার অস্পষ্ট অবয়ব। নৌকোটা তীরে এসে ভিড়লো। ছায়া ছায়া দু'টো লোককে ও দেখতে পাচ্ছিলো। বদ্রী আর দেরি করলো না। ছোট্ট ঘরটা থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে নেমে কেদারের কাছে চলে এলো।

কেদারদা! সিগন্যাল দাও। কুইক!

বদ্রীর ঘর থেকে লাফিয়ে নামা দেখে ফেলেছিলো সেই ভারী গলার লোকটা।

আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে সে ওপরে উঠে আসছিলো। ও কি সন্দেহ করেছে কিছু!

কেদারের হাতের পেনসিল টর্চটা শ্মশানের জ্বলন্ত চুল্লিটার দিকে মুখ করে দু'বার জ্বলে ওঠামাত্রই প্রথম চিতার শবযাত্রীরা এইমাত্র আসা শবযাত্রীদের ওপর চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আক্রান্তরা হতভম্ব! কে একজন বললো, ওস্তাদ! এগুলো সব পুলিস! ওঁত পেতে বসেছিলো। পরক্ষণেই দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি শুরু হয়ে গেলো।

কেদার ততক্ষণে ওয়্যারলেসের বোতাম টিপেছে। ওপার থেকে যান্ত্রিক শব্দ—হ্যালো, বিনয় ভট্টাচার্য বলছি! ওভার!

কেদার বলছি। অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। জলদি আসুন। ওভার।

কোন ভয় নেই। জাল পাতা আছে। সব মাছ ধরা পড়বে। ওভার।

দু'টো লোক আমাদের দিকে আসছে! সামলাতে হবে! ছাড়ছি।

বদ্রী চিৎকার করে বললো, দু'জন নৌকা করে পালাচ্ছে কেদারদা! বোধহয় ওদের কাছেই আইভরিটা আছে!

কেদার ছুটে গঙ্গার পাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তখনই প্রচণ্ড শক্তিশালী এক লাথিতে ছিটকে পড়ে গেলেন। বাঁ হাতের কনুইটা পড়লো একটা ভাঙা ইঁটের টুকরোর ওপর। যন্ত্রণায় কেদারের মুখ থেকে 'আঃ' করে শব্দ বেরিয়ে এলো। সেই ভারী গলার লোকটাই লাথি ছুঁড়েছে। মূর্তিমান যমের মতো লোক দু'টো তখন ওদের সামনে। বদ্রী হাতের পেনসিল টর্চটা দিয়ে লোকটার নাকে আঘাত করলো। দু'হাতে নাক ধরে লোকটা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। পরক্ষণেই দারুণ রাগে গর্জে উঠে বদ্রীর দিকে তেড়ে গেলো। বদ্রী চট করে বাঁ পাশে সরে গেলেও রেহাই পেলো না। দ্বিতীয় লোকটা বদ্রীকে জাপটে ধরে ফেললো। প্রথম লোকটা বদ্রীর গায়ে হাত ওঠাতে না ওঠাতেই বিকট চিৎকার করে হাত পাঁচেক শূন্যে উঠে গিয়ে সশব্দে মাটিতে আছাড় খেলো। আসলে ক্যারাটে মাস্টার কেদার ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে পড়েছিলেন। জুডোর প্যাঁচে লোকটাকে একেবারে শূন্যে তুলে দিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে শ্মশানযাত্রীর ছদ্মবেশে এতক্ষণ বসে থাকা পুলিসের দল আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত নকল শববাহকদের কিছুক্ষণের মধ্যেই কাবু করে ফেললো। মড়ার খাট তল্লাশী করে দেখা গেলো, কোন মৃতদেহ নেই। দু'টো পাশবালিশ কাঁথা দিয়ে মুড়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আর কোন কিছুই

পাওয়া গেলো না। ত'হলে আইভরির বেদী? এরা কি তবে বেদী-চোরের দল নয়?

বড় রাস্তা থেকে শ্মশানে ঢোকার মুখে একটা সাদা বাড়ির আড়ালে জীপটা দাঁড় করিয়ে রেখে বিনয় ভট্টাচার্য এতক্ষণ গতিবিধি নজর রাখছিলেন। কেদার মজুমদারের ওয়্যারলেস মেসেজ পেয়েই তিনি ফের দ্রুত অন্য লাইনে ওয়্যারলেস করে ওসি রমাপদ চ্যাটার্জিকে ধরলেন।

হ্যালো স্যার! আমি ভট্চাজ্ বলছি। ওভার!

বলো। নতুন খবর আছে? স্টেশনে তো চোরেদের পাত্তা পেলাম না। ওভার।

আপনি আপনার ফোর্স নিয়ে সোজা শ্মশানঘাটে চলে আসুন স্যার! পুরো দলটাই এখানে এসেছে। ধরাও পড়েছে। এখনো হাতাহাতি লড়াই হচ্ছে কেদারবাবুর সঙ্গে। ওভার।

তাই নাকি! ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ওখানে যাচ্ছি। ওভার।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার! ওভার।

বিনয় ভট্টাচার্য এবার জিপ স্টার্ট করে শ্মশানঘাটের দিকে ছুটলেন। জিপের গর্জন রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিলো। জিপের শব্দে চমকে গেলো ভীষণ লড়াকু, দলের পাণ্ডা সেই ভারী গলার লোকটা। ক্যারাটে মাস্টার কেদারের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে লড়ছিলো। কেদার একটা প্যাঁচ দিলে সেও পাল্টা প্যাঁচ মারছিলো। দু'জনেই রক্তাক্ত। দ্বিতীয় জন ছিলো আনাড়ি। বদ্রী ওকে ঘায়েল করে দিয়েছে। জিপের শব্দে লোকটা চমকে উঠতেই কেদারের হাত লোকটার কানে ঘা মারলো। আঘাত মারাত্মক। কিন্তু এই আঘাত মাথা গরম করে দেয়। প্রতিপক্ষ সতর্ক না থাকলে আঘাতপ্রাপ্ত লোক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটলো। লোকটার কান ঝাঁ—ঝাঁ করছিলো। মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিলো। লোকটা বিকট পাশব আওয়াজ করে প্রায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো কেদারের ওপর। লোকটার গতির তীব্রতা এত অবিশ্বাস্য রকমের বেশি ছিলো, যা ধারণারও অতীত। কেদার নিজেকে বাঁচাবার একটুও সময় পেলো না। কেদারকে নিয়েই মাটিতে পড়লো লোকটা। পড়েই হাঁটু দিয়ে অমানুষিকভাবে কেদারের পেটে মারতে লাগলো। প্রথম মারটা খেয়েই কেদারের গা গুলিয়ে উঠলো। কিন্তু কেদার প্রশিক্ষিত ক্যারাটে মাস্টার। নিমেষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পেটটা শক্ত করে ফেললেন কেদার। কষ্টটা সইয়ে

নিতে সময় নিলেন। মাথা ঠাণ্ডা করে পাল্টা আঘাত করার মোক্ষম জায়গা খুঁজতে লাগলেন। পেয়েও গেলেন। লোকটার মুখ বারবার কেদারের হাতের নাগালে চলে আসছিলো। এবার কেদার হিসেব করে নির্ভুলভাবে লোকটার কপালের একটা বিশেষ স্নায়ুতে ডান হাত বাড়িয়ে জোরে টোকা দিলেন। কোন শব্দ বের হলো না। কেদারকে ছেড়ে কাটা ছাগলের মতো লোকটা ডানপাশে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগলো। বদ্রী এবার চেঁচিয়ে উঠলো।

কেদারদা! আর দেরি নয়। ওরা নৌকো করে চোরাই মালটা নিয়ে পালাচ্ছে!

বিনয় ভট্টাচার্যের জিপও তক্ষুণি শ্মশানের সামনে থামলো। বদ্রীনারায়ণ আবার চেঁচালো—

বিনয়বাবু! দু'জন নৌকো করে পালাচ্ছে! ওদের ধরুন!

কেদার, বিনয়বাবু আর বদ্রী, তিনজনে তিনদিক থেকে গঙ্গার পাড়ের দিকে দৌড়োলো। বিনয় ভট্টাচার্যের হাতে রিভলভার। কেদার নদীতে টর্চের আলো ফেললেন। ডিঙি নৌকোটা ততক্ষণে দু'শো হাত দূরে চলে গেছে। বিনয় ভট্টাচার্য চিৎকার করে বললেন—নৌকা থামাও! নইলে গুলি করবো! —ওরা বৈঠা বাইতেই লাগলো। ডিঙিটা ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। বদ্রীর মনে হলো, বহুদূরে, সীমান্তের নো ম্যান্স ল্যাণ্ডের থেকেও আরো অনেক দূরে, পদ্মার ওপার থেকে একটা শক্তিশালী টর্চের আলো বারবার নিভছে আর জ্বলছে। তার মানে বাংলাদেশে এদের এজেন্টরা সম্ভবত রেডি হয়েই আছে। কিন্তু এখনো চোরাই মালের তো কোন হদিশই নেই! বদ্রীর হুঁশ ফিরলো। ও বললো, বিনয়বাবু, ওরা তো খানিকক্ষণের মধ্যেই সীমান্তের ওপারে চলে যাবে!

না, যেতে পারবে না। আজ সারা সন্ধ্যে ওদের পাল্টা আমিও ঘুঁটি সাজিয়েছি। বলেই বিনয় ভট্টাচার্য পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে জোরে ফুঁ দিলেন। হুইসল বাজামাত্রই গঙ্গার বুকে অনেকগুলো সার্চলাইটের সাদা আলো জ্বলে উঠলো। দিনের মতো সেই আলোর বন্যার মাঝখানে পালিয়ে যাওয়া সেই নৌকো বন্দী হয়ে গেলো। চারটে নৌকো আর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটা লঞ্চ ঘিরে ফেললো নৌকোটাকে। নৌকোর মধ্যে দুই মাঝিকে নিয়ে মোট চারজন তখন হাত তুলে বসে আছে। বি এস এফ-এর দুই জওয়ান ততক্ষণে নৌকোয় নেমে পড়েছে। বিনয়বাবু বদ্রীকে বললেন, নদীপথ সীল করার জন্য আমি আজ সন্ধ্যেয় বি এস এফ এর আঞ্চলিক কমাণ্ডারকে রেডিওগ্রাম করেছিলাম।

ডিঙি পারে নিয়ে আসা হলো। বি এস এফ ডিঙির দুই মাঝি আর দুই স্মাগলারকে মুন্সিগঞ্জ পুলিসের হাতে তুলো দিলো। মাটির হাঁড়ির মধ্যে পাওয়া গেলো মুক্তোদানা দিয়ে কাজ করা মূল্যবান আইভরি বেদীটা। বিনয়বাবু হাসতে হাসতে তাঁর কনস্টেবলদের জিজ্ঞেস করলেন, নকল চিতা জ্বালাতে ক' মোন কাঠ পুড়লো?

প্রায় দশ মোন।

তা তো হবেই। সেই সন্ধ্যে থেকে রাত তিনটে অবধি জ্বললো।

কিন্তু কেদারবাবুর জন্য তো ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনার তো সারা শরীর রক্তাক্ত।

ঠিক আছে, চলুন। মুন্সিগঞ্জে ফিরে যাওয়া যাক আগে।

একজন কনস্টেবল এসে বললো, স্যার, দলের পাণ্ডাটাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

আরে! ওটা তো কেদারবাবুর হাতে বেদম মার খেয়ে ওই তেঁতুলগাছের নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো!

জ্ঞান হতেই পালিয়েছে।

ভোর হয়ে আসছিলো। পূর্ব আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। কেদার ঘড়ি দেখলেন। ভোর চারটে দশ। একটা ঘটনাবহুল রাত পার হয়ে গেলো। কেদার মনে মনে বললেন। কিন্তু না! তখনও কিছু বাকি ছিলো। শ্মশান থেকে কিছু দূরে রাস্তায় একটা চেঁচামেচি শোনা গেলো বাঁচাও—বাঁচাও আওয়াজ।

বিনয়বাবু বললেন, সবাইকে যেতে হবে না। কেদারবাবু আর আমি যাচ্ছি। বদ্রী এখানে থাকুক। দু'জন কনস্টেবল আমাদের সঙ্গে আসুন। —চারজন রাস্তায় উঠে দৌড় লাগালেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন—বীভৎস দৃশ্য!

সেই ভারী গলার লোকটা, যে এই দলের পাণ্ডা, তার সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! বিশাল মোটা সেই সাপটা আষ্টেপৃষ্টে পেঁচিয়ে ফেলেছে লোকটাকে। সম্ভবত ছোবলও মেরেছে। কারণ লোকটার শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে। তখনও বলছে—বাঁচাও বাঁচাও! কিন্তু গলার জোর কমে গেছে। কেদার আর বিনয়বাবু স্থাণুর মতো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাপটার তীক্ষ্ণ ছুরির মতো জিভ লক্‌লক্‌ করছিলো। প্রচণ্ড ফোঁসফোঁসানি। বিনয়বাবু আর সহ্য করতে পারছিলেন না। কোমর থেকে রিভলভার বের করলেন। কেদার বিনয়বাবুর হাতটা ধরে ফেললেন।

গুলি ছুঁড়ে কাকে মারবেন? কাকেই বা বাঁচাবেন! অপেক্ষা আমাদের

করতেই হবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই।

বিনয়বাবু কেদারের কথা শুনে রিভলভারটা খাপে ঢুকিয়ে রাখলেন। লোকটা ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে। ওর গলা দিয়ে ঘরঘর আওয়াজ উঠছে। সাপটা যেন আরো কঠিন প্যাঁচে ওকে বেঁধে ফেলছে। লোকটার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো। একসময় মৃত্যুযন্ত্রণায় শেষ আর্ত চিৎকার করে পেঁচানো অবস্থাতেই কাত হয়ে পড়ে গেলো। তারও আরো অনেকক্ষণ পরে সাপটা লোকটাকে ছেড়ে ঝোপঝাড়ের দিকে চলতে শুরু করলো। কেদার তক্কে তক্কে ছিলেন। দ্রুত কোমর থেকে কোল্ট রিভলভারটা তুলে অব্যর্থ নিশানায় দু'বার গুলি করলেন। সাপের মাথাটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। গুলির শব্দে সবাই চমকে উঠেছিলো। দৌড়ে এলো অনেকেই। বদ্রীও দৌড়ে এলো। সাপটা তখন রক্তাক্ত অবস্থায় এলোপাথারি দাপাচ্ছিলো। তখনই মুন্সিগঞ্জ নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির একমাত্র অ্যাম্বুলেন্সটা সেখানে এসে দাঁড়ালো। খবর দেওয়া হয়েছিলে থানা থেকেই। খানিকক্ষণ বাদে ওসি রমাপদ চ্যাটার্জিও ফোর্স নিয়ে হাজির হলেন।

মধুরেন সমাপয়েৎ

পরের দিন সকাল থেকেই মুন্সিগঞ্জ ও সন্নিহিত এলাকার খরা পরিস্থিতি জানতে কেদার বদ্রীর জুটি কাজে নেমে পড়লো। মুন্সিগঞ্জ থানা ওদের জন্য একটা প্রাইভেট জিপেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। প্রচুর সাহায্য করেছিলো পুলিস। তার পরের দিনই ওরা কলকাতা রওনা হলো। এর দু'দিন বাদে দৈনিক যুগবার্তার রবিবারের পাতায় মুন্সিগঞ্জ আর লস্করপুরের খরা নিয়ে ছবিসহ দারুণ রিপোর্ট বের হলো। ওদিকে মুন্সিগঞ্জে সরকারি ত্রাণকার্যও শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

রবিবার সকালে বাগবাজারে উদিতভানু ইনফরমেশনের অফিসে বসে দৈনিক যুগবার্তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কেদার জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে বদ্রী! সেদিন তুই যে অত কনফিডেণ্টলি ওসি-কে বললি, চোরেরা পালায়নি! চোরাই মাল পাচার হয়নি! বুঝলি কি করে?

ওসি তোমায় তাচ্ছিল্য করছিলো দেখে রোখ চেপে গিয়েছিলো আমার। একটা অদ্ভুত ইচ্ছা মনের মধ্যে ধাক্কা মারতে লাগলো। সেদিনকার রাতের অন্ধকারে লোকগুলোর টুকরো টুকরো ফিসফিস করে বলা কথাগুলো অঙ্কের মতো আমার চোখেব সামনে ফুটে উঠলো তখন। আমি কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে ফেললাম। যেমন—এক; 'কাজটা হয়ে গেছে।' দুই; 'ওরা এখনো আসেনি ? তিন; 'না আসেনি।' চার; 'না, আর ওয়েট করা যাবে না। সট্‌কে পড়তে হবে।' পাঁচ; 'প্ল্যান একদিন পিছিয়ে দিচ্ছি।' ছয়; 'চ চ, শেলটারে ঢুকে পড়।' সাত; ভারী গলার লোকটার হুকুম—'অ্যাই! তুই এদিকে আয়! মাল নিয়ে আমার সঙ্গে যাবি।' আমার মন বলছিলো, এর থেকে এই জাতীয় একটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। তাই ওসি-কে ওই কথা বলেছিলাম।

তক্ষুণি টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কেদার ফোন ধরলেন।

হ্যালো!

হ্যালো, কেদার! আমি ভাস্কর বলছি।

বলো বলো!

তোমার লেখাটা তো বেরিয়েছে। দেখেছো ?

হ্যাঁ।

তোমার চেকটা পোষ্টে চলে যাবে।

ঠিক আছে।

ছাড়লাম এখন। পরে কথা হবে।

আচ্ছা। বলে টেলিফোন নামিয়ে কেদার বদ্রীকে বললো, কিছু টাকাপয়সা জুটছে তা'হলে খরার রিপোর্টিং করে।

তাই নাকি! ফাইন! বদ্রী হাততালি দিয়ে উঠলো। ফের টেলিফোন বাজলো।

আবার কে ? —বলে কেদার টেলিফোন ধরলেন।

হ্যালো!

এটা উদিতভানু ইনফরমেশন ?

হ্যাঁ। কে বলছেন ?

আমি মুন্সিগঞ্জ থেকে বিনয় ভট্টাচার্য, সেকেণ্ড অফিসার কথা বলছি। কেদার মজুমদার আছেন নাকি!

আরে বলুন বলুন! আমি কেদার বলছি।

আজকের কাগজে আপনাদের লেখা পড়লাম। খুব ভালো রিপোর্টিং হয়েছে। ভালো খবরও আছে।

কী খবর ?

আজ সকাল থেকে দারুণ বৃষ্টি নেমেছে মুন্সিগঞ্জে। লোকজন রাস্তায় নেমে বৃষ্টিতে ভিজছে।

বা ! দারুণ খবর ! এর থেকে আনন্দের আর কি ই বা হতে পারে !

ছাড়ছি এখন। আমার অভিনন্দন রইলো।

আপনার সাহায্যের কথা ভুলি কি করে ! অনেক ধন্যবাদ। আমার আর বদ্রীর পক্ষ থেকে।

ছাড়ি তাহলে !

হ্যাঁ। দেখা হবে আবার।